বইঘর নিবেদন

ওয়ান আপ টু ডাউন

নিমাই ভট্টাচার্য

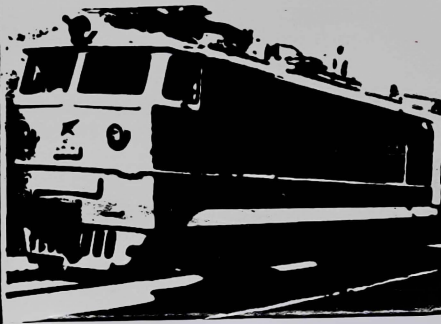

ONE UP-TWO DOWN
A Bengali Novel by NIMAI BHATTACHARYYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 60.00

ISBN 81-7079-424-2

প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৭, এপ্রিল ১৯৮০
ষষ্ঠ সংস্করণ : বৈশাখ, ১৪১৭, এপ্রিল ২০১০

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

৬০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুঃসাহসিক ও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক

শ্রীসমরেশ বসুকে

কেউ চাঁপা, কেউ চামেলি। কেউ কৃষ্ণচূড়া, কেউ সূর্যমুখী। কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে গন্ধ ছড়ায়, কেউ প্রকাশ্যে। কেউ রঙ আর রূপের প্রচার করে, কেউ করে না।

হিমালয়ের কোলেই জন্ম নিয়েছে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র। একজন শান্ত, একজন চঞ্চল। গঙ্গার দুকূলে আছে শিবের মন্দির, দেবীর আসন, বটের জটা। জীবনে মরণে তার প্রয়োজন। ভয়ে নয়, ভক্তিতে। আর ব্রহ্মপুত্র? সে যেন চলমান বিভীষিকা। মানুষের সুখের সংসার ছারখার করেই তার আনন্দ কৃতিত্ব। মহত্ত্ব।

এ যেন একই দেবীর ভিন্ন রূপ। একজন প্রসন্ন-বদনা মা ভগবতী। আরেকজন যেন দেবী ছিন্নমস্তা!

এমন তো হয়ই। ঘরে ঘরে। সংসারে ও প্রকৃতিতে। সর্বত্র। বিনোদবাবুর মেয়েদের দেখলেই বোঝা যায়।

তালা খুলে অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই মেঝের ওপর খামটা পেলাম। খাম! খামে তো কেউ আমাকে চিঠি লেখে না! অবাক হয়েছিলাম। তাছাড়া চিঠিপত্র লেখেই বা কে? মাঝে মাঝে মা'র চিঠি আসে। কিন্তু সে তো পোস্টকার্ডে। কদাচিৎ কখনও বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি আসে। তাও খামে নয়। পোস্টকার্ডে! বড় জোর ইন্‌ল্যান্ড।

তাইতো তাড়াতাড়ি খামটা ছেঁড়ে চিঠিটা দেখছিলাম। কে লিখেছে?

কে?

বীথি?

নিজের চোখকেই নিজে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আর একবার ভালো করে দেখলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বীথি। এইত শেষে লেখা 'তোমার বীথি'।

তোমার বীথি?

একটু হাসলাম। না হেসে পারলাম না। অথচ হাসতে চাইনি। ও তো বিশেষ চিঠিপত্র লেখে না। একেবারেই লেখেনি তা নয়। বছরে একটা-দুটো। বড়

জোর তিনটে। তাও ইন্‌ল্যান্ডে। ও বেশ ভালো করেই জানে আমি যাদের ফ্ল্যাটে ঘর নিয়ে থাকি তারা বাঙালি নয়। তারা বাংলা পড়তে পারে না। সুতরাং চিঠির কথা জানতে পারবে না কেউ। ইন্‌ল্যান্ড লেটারেই ও আগে অনেক গোপন কথা, নিজের কথা লিখেছে। আমি বাংলাদেশে থাকলে বা এই দিল্লিতেও কোনো বাঙালির বাড়িতে থাকলে ও ওইসব কথা খামে লিখতেও সাহস করত না। তবুও যখন খামে চিঠি দিয়েছে নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কারণ আছে।

অথবা?

অথবা খুব বেশি গোপনীয়।

কিন্তু চিঠিটা পড়ার আগেই ওদের বাড়ির ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কেউ চাঁপা, কেউ চামেলি। কেউ কৃষ্ণচূড়া, কেউ সূর্যমুখী।

এককালে সারা পাড়াটা জুড়ে ছিল বড়লোকের বাগানবাড়ি। মাঝে মাঝে দু-চারটে সাহেবসুবোর বাংলো। বড় লোহার গেট। বাড়ির চারপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ধার দিয়ে গাছপালা-লতাপাতা। সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, নাগালের বাইরে ওরা থাকত।

আজকাল সবকিছু পালটে গেছে। একদম বদলে গেছে। সারা টালিগঞ্জই বদলে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় যা দেখেছি, তা আজ কল্পনা করা যায় না। জীবনেও আর সে দৃশ্য দেখতে পাব না। মানুষে মানুষে গিজ গিজ করছে সারাটা অঞ্চল। গাছপালা-লতাপাতা আর নেই। জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। এখন শুধু মানুষের অরণ্য। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের অরণ্য।

আমাদের ঠাঁইও এই অরণ্যেই। মূর এভিন্যুর মোড়েই। ঠিক পিছনের বাড়িটাই বীথিদের। মাঝে একটা নালা আর খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়েই ওদিকের একটা পুকুরে যাওয়া যায়। তবে কেউ যায় না। যাবার দরকার হয় না। ছেলেবেলায় আমরা যেতাম চোর-চোর লুকোচুরি খেলতে। বনভোজন করতে।

বড় হবার পরও গেছি।

আমাদের মতো বীথিরাও অনেকদিনের বাসিন্দা। বীথির বাবা ওখানে থাকেন না। বরাকরের কাছে একটা কোলফিল্ডে চাকরি করেন। অনেকদিন ধরেই ওই চাকরি করছেন। শনিবারে-শনিবারে বাড়ি আসেন। সোমবার

ভোরেই চলে যান। তবুও পাড়ার সবাই ওঁকে চেনেন। ট্রাম ডিপোর কাছে পুরনো রিকশাওয়ালাদের বললেও ওরা ঠিক বিনোদবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেবে। পুরনো দোকানদাররা বিনোদবাবুর বাড়ি না চিনলেও বিনোদবাবুকে চেনে।

বিনোদ বিহারী সরকারের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত। বরং নিম্নবিত্ত। ঠিক জানি না, বোধহয় আই-এ পাস। সামান্যই চাকরি করেন। স্টোর ক্লার্ক। বড়জোর আড়াইশো-পৌনে তিনশোর মতো মাইনে পান। তাও এতোদিন চাকরি করার পর। হয়তো আশি-নব্বুই বা একশ' টাকায় ঢুকেছিলেন। স্টোরে কাজ করেও উপরি আয় আছে বলে মনে হয় না। হলেও বড় জোর কলকাতায় আসা-যাওয়ার খরচা তুলতে পারেন।

সে যাই হোক বীথির বাবা ভদ্রলোক। আমরা মেসোমশাই বলে ডাকি। ছেলেবেলা থেকেই। বীথির মাকে মাসিমা বলি। ওদের বাড়িতে অসুখ হলে আমার বাবাই চিকিৎসা করেন। বেশি সিরিয়াস কিছু হলে অবশ্য আলাদা কথা। তখন কে আর আমার বাবার মতো এইচ. এম. বি. হোমিও-র উপর নির্ভর করে বসে থাকবে? মাসিমার বেশ সিরিয়াস অসুখ হয়েছিল। বাবা নিজেই বলেছিলেন বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

বীথির মায়ের তলপেটের ব্যথাটা অনেক দিনের। পর পর বাচ্চা হবার জন্যই বোধহয়। এখনই তো বীথিরা তিন বোন– এক ভাই। দু-টি ভাই মারা গেছে খুব ছেলেবেলায়। তা হোক। মাসিমার যেটুকু কষ্ট হবার তা তো হয়েছেই। শরীরের যেটুকু ক্ষতি হবার তাও হয়েছে। এর উপর বছরের পর বছর সংসারের জন্য উদয়-অস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি। সবকিছুই তো এক হাতে।

ব্যথাটা যখন বেশি হতো তখনই স্মৃতিদিকে বলতেন, হ্যাঁরে খুকু, একবার জ্যাঠামণির কাছে যাবি নাকি?

স্মৃতিদি সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে মাসিমার পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'বেশি ব্যথা করছে?'

'হ্যাঁ।'

বেশ জোরেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসত মাসিমার। স্মৃতিদিরও।

একটু থেমে আবার বলতেন, তোর জ্যাঠামণিকে গিয়ে বলত তলপেটের বাঁ দিকটায় নীচের দিকে বেশ ব্যথা করছে।

'আর কিছু বলব?'

বলার তো আরো কিছু ছিল কিন্তু সেসব কথা কি মেয়েকে বলা যায়? নাকি ওর জ্যাঠামণিকে বলা যায়?

স্মৃতিদি তখন বেশ বড় হয়েছে! অনেক কিছু বুঝত। সন্দেহ করত আরো অনেক কিছু। তবে ঠিক ধরতে পারত না। মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জাবোধ করত।

তাছাড়া আরো অনেক কারণ ছিল।

জ্যাঠামণির ওষুধ নিতে পয়সা লাগে না। ট্রাম ডিপোর মোড়ে বা রানীকুঠির ওধারের ভালো ডাক্তারের কাছে গেলেই বেশ ক'টা টাকা বেরিয়ে যাবে। বাঙ্গুর হাসপাতালে গিয়েও লাভ নেই। প্রথম কথা আউটডোরের ডাক্তারগুলো যেন হাওড়া স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক। মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই ওরা গোজামিল দিয়ে দায়িত্ব শেষ করবে। একে তো কিছু শুনবে না, তারপর লম্বা চওড়া প্রেসক্রিপসন লিখবে। তাও আবার একরকম ঔষধ লিখে ওরা শান্তি পায় না। মিক্সচারটা থ্রাইস ডেইলি আফটার মিল, টু ট্যাবস উইথ হট ওয়াটার...

লিখে যাও, লিখে যাও। তোমাদের আর কি? আউটডোরের সব রুগীদের বাড়িতেই নোট ছাপার মেসিন আছে।

...আর এই সিরাপটা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে দু-চামচ করে খাবেন।

পোড়ারমুখো ডাক্তারগুলো এরপরও কিছু ফালতু উপদেশ দিতে ছাড়ে না।

...একটু বেশি করে দুধ-ডিম খাবেন। আর তেল-মসলার রান্না বিশেষ খাবেন না।...

তাইতো জ্যাঠামণিই একমাত্র ভরসা!

স্মৃতিদি বাবার ডিসপেন্সারিতে আসতেই বাবা জিজ্ঞাসা করতেন, 'বৌমার শরীর কেমন আছে রে?'

'মার শরীর ভালো না জ্যাঠামণি।'

'ব্যথাটা বেড়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'পেচ্ছাবটা কি বেশি সাদা সাদা হচ্ছে?'

'তা তো জানি না।'

'যা জিজ্ঞেস করে আয়।'

স্মৃতিদি হয়তো আমাকেই বলত, যা তো বেণু দৌড়ে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে আয় তো।

আমি বলতাম, চল দুজনেই যাই।

আমি আর স্মৃতিদি পিছনের নালা পেরিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে যেতাম। স্মৃতিদি সন্ধ্যার পর এই রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় পেত। সামনের দিকে

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে যেতেও পছন্দ করত না। বড় ভিড়! রিকশাওয়ালাগুলো তো গায়ের উপরেই এসে পড়ে। নালাটা পার হবার পরই স্মৃতিদি আমার হাতটা টেনে ধরে বলত, 'অত লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'এই লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া?'

'তবে কি?'

আমি ওদের বাড়ির দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। স্মৃতিদি দৌড়ে রান্না ঘরে মাসিমার কাছে গিয়ে কথাটা জেনেই বেরিয়ে আসত। আবার আমরা ওই পিছনের জঙ্গল আর নালা পেরিয়ে আসতাম আমাদের বাড়িতে। তারপর সামনের দিকের ডিসপেন্সারিতে।

এই পিছনের রাস্তা দিয়ে স্মৃতিদির সঙ্গে যাবার সময় কি কাণ্ডটাই না হয়েছিল একবার! আমি তখন ক্লাশ টেন-এ পড়ি। আমাদের বাড়িতে সেদিন কিছু একটা ছিল। ওরা সবাই এসেছিল। মাকে সাহায্য করার জন্য স্মৃতিদির যেতে যেতে বেশ রাত হল। আমিই পৌঁছে দিচ্ছিলাম। দুজনেই লাফ দিয়ে নালা পার হলাম। আমাদের পায়ের শব্দে একটা বড় ইঁদুর ভয় পেয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ করে ছুটে পালাল। ও ভীষণ ভয় পেয়ে একটা বিকট চিৎকার করে আমাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। ওর ওই চিৎকার শুনে আমিও মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। একটু পরেই আমার হুঁশ হল। বুঝলাম আমাকে ও জড়িয়ে ধরে কাঁপছে। ভয়ে স্মৃতিদি ভীষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। বুকটা বড্ড বেশি ওঠানামা করছিল। মনে হচ্ছিল আমিও যেন জোরে জেরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আর বুকটা খুব বেশি ওঠা-নামা করছে।

আরো একটু পরে, এই মিনিট খানেক পরে আমার ভীষণ লজ্জা করল। হাজার হোক স্মৃতিদি তখন বেশ বড় হয়েছে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। আমিও তখন একেবারে শিশু নই। এর আগে অতবড় কোনো মেয়ে আমাকে অমন করে জড়িয়ে ধরেনি। লজ্জা করবে না?

সারা গাটা কেমন যেন একটু শির শির করে উঠেছিল।

অস্বস্তিবোধ করলেও আমি মুখে কিছু বলতে পারলাম না। চুপ করে অসাড় হয়ে ওর বুকের মধ্যে পড়ে রইলাম।

এরপর ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওটা কি গেল রে বেণু?'

'ইঁদুর।'

'ইঁদুর?'

'তুই ঠিক দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

স্মৃতিদি আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তুমি ভীষণ ভীতু।'

যাই হোক ও ডিসপেন্সারিতে গিয়ে বাবাকে বলতো, 'হ্যাঁ জ্যাঠামণি আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

বাবা আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। হয়তো করতে পারতেন না। দু-চার পুরিয়া ওষুধ দিয়ে বলতেন, দু-ঘণ্টা ছেড়ে ছেড়ে আজ রাত্রেই দুটো পুরিয়া খেতে বলবি। ভোরের দিকে আর একটা। তারপর আমাকে জানাস।

ওপাড়ার সবার সঙ্গেই আমার আলাপ। বাবার আলাপ। মা আর টেনুর সঙ্গেও অনেকের আলাপ। অনেক বাড়ির সঙ্গেই আমাদের যাতায়াত, বাবাকে তো বহুলোকের বাড়িতেই যেতে হয়। এক টাকা বা দু-টাকা ফি দিয়ে আর কোনো ডাক্তারকে বাড়িতে 'কল' দেওয়া যায় না বলে বাবার পসার বেশ ভালো। অধিকাংশ লোকের অবস্থাই বেশ খারাপ।

বিনোদবাবু– মেসোমশাইয়ের সঙ্গে বাবার একটু স্পেশাল খাতির ছিল। খাতির নয়, বন্ধুত্ব বলাটাই ঠিক হবে। শুনেছি দুজনে একই ছাতি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ি তৈরি করিয়েছেন। ওঁদের আলাপ তারও আগে থেকে। একই দিনে একই সময়ে দুজনে জমি দেখতে এসেছিলেন। তখন এদিকটা নেহাতই জঙ্গল ছিল। ট্রাম ডিপোর এপাশে এত গাড়ি-ঘোড়া চলবে, এত লোক থাকবে সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

মেসোমশাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানে বাড়ি করা কি ঠিক হবে?

বাবা বলেছিলেন, 'আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের এত চিন্তা-ভাবনা করলে কোনোকালেই কিছু হবে না।'

'তা ঠিক। তবে...'

'তবে আবার কি?'

'আমি তো কলকাতায় চাকরি করি না।'

'এখান থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করবেন তো?'

'না। আমাকে কোলফিল্ডেই থাকতে হবে।'

তারপর বাবা বলেছিলেন, 'কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। আমরাও তো থাকব। বৌমা আর ছোট্ট একটি মেয়েকে আমরাও দেখাশুনা করতে পারব।'

ব্যস। তারপর আর মেসোমশাই দ্বিধা করেননি। বাবাকে দাদা বলে ডেকে

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মেসোমশাই বলেছিলেন, সবই আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম।

সেসব অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও আমার জন্ম হয়নি। ওবাড়িতে তখন শুধু স্মৃতিদি হয়েছে। তারপর হল গীতিদি। আমার ঠিক এক বছর আগে। মাসিমার পর পর দুটো ছেলে নষ্ট হবার পর হয়েছে বীথি।

বীথি!

বীথি আমার চাইতে ঠিক তিন বছরের ছোট। ছেলেবেলায় আমাদের দুজনের ততো ভাব ছিল না। গীতিদির সঙ্গেই আমার বেশি ভাব ছিল। মেলামেশা ছিল। একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি। প্রথম প্রথম একই স্কুলে পড়েছি। কিন্তু বড় হবার পর বীথির সঙ্গেই আমার বেশি ভাব হয়েছে।

সেই বীথি চিঠি লিখেছে।

বীথি আর সেই বীথি নেই। অনেক বদলে গেছে। তবুও ভালো লাগল।...

বেণুদা, ঠিক এক বছর পর তোমাকে চিঠি লিখছি। এর মধ্যে তুমি যখন কলকাতা এসেছিলে তখন অবশ্য দেখা হয়েছে। তুমি এখানে এলে এত বেশি আড্ডা দাও আর খেলা দেখে বেড়াও যে বিশেষ কথাবার্তা হতে পারে না। তাছাড়া কলকাতার যা পরিবেশ! ঠিকমতো কথাবার্তা হওয়া অসম্ভব।

যাই হোক আমি 'উত্তরের পথে' ছবির আউটডোরের জন্য দিল্লি আসছি। রোলটা সামান্যই কিন্তু ইন্টারেস্টিং। আমার রোলের প্রায় সবটাই দিল্লির আউটডোরে সুটিং হবে। স্টুডিওতে মাত্র একদিনের কাজ। এই রোলের জন্য শ্রীলা ব্যানার্জিকে ডাইরেক্টর ঠিক করলেও ও একলা আউটডোরে যেতে রাজি নয় বলে শেষ পর্যন্ত রোলটা আমি পেয়েছি। ফিল্মের লোকগুলো ঠিক সুবিধের হয় না তা তো তুমি জানো। কোনো মেয়ের পক্ষেই একলা একলা আউটডোরে যাওয়া উচিত নয়। আমার প্রোডিউসারের আগের ছবিটি মার খেয়েছে বলে এই ছবির বাজেট কেটেছেন। ওই সামান্য রোলের জন্য একজন মেয়ে আর তার এসকর্টের খরচা দিতে প্রডিউসার নারাজ।

আমি 'এসকর্ট' ছাড়াই দিল্লি যেতে রাজি হয়েছি শুধু তোমার জন্য। তুমি একথা বিশ্বাস না করলেও আমি মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। তুমি আমার সম্পর্কে যাই মনে করো না কেন, আমি তোমারই। এমন বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছু করছি। করতে বাধ্য হচ্ছি। না করে কোনো উপায় নেই। সে যাই হোক তার জন্য তোমার আমার সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে না।...

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবলাম বীথি এত বড় চিঠি লিখল?

পাতা উল্টে আবার পড়তে শুরু করলাম, চিঠি বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। এসব কথা লিখে আর বড় করব না। দেখা হলে সব কথা হবে। দেখা হলে যা ইচ্ছে তাই বলো।

এবার কাজের কথা বলি। রবিবার ডিল্যুক্সে রওনা হচ্ছি অ্যাডভান্স পার্টির সঙ্গে। হিরো, হিরোইন, প্রডিউসার, ডাইরেক্টর আর ক্যামেরাম্যান বুধবার প্লেনে যাবেন। চেয়ারকার-এ থাকব। তুমি নিশ্চয়ই স্টেশনে আসবে। আমি ওদের সঙ্গে হোটেলে থাকব না– তোমার কাছেই থাকব...

লাইনটা শেষ করার পর হঠাৎ চমকে উঠলাম। বীথি আমার কাছে থাকবে! আমার তো এই একটাই ঘর! ব্যাচেলার লোক। একটা ঘরের বেশি দিয়ে আমার কি হবে? বীথি তো এসব জানে তবুও...

নাঃ! চিঠিটা শেষ করেই ভাবা যাবে।

...আমি এদের সবাইকে বলেছি আমার জ্যাঠতুতো ভাই দিল্লিতে থাকে এবং আমি তার কাছেই থাকব। আমি ওদের সামনে তোমাকে ছোড়দা বলে ডাকব। তা নয়তো ওরা সন্দেহ করতে পারে। তুমি আমাকে নাম ধরেই ডেকো আর তুই তুই করে কথা বলবে! তোমার পাঞ্জাবি বাড়িওয়ালীদের ঠিকমতো বলে রেখো।

স্টেশনে না এলে আমি কিন্তু মহা বিপদে পড়ব। নিশ্চয়ই এসো।

আমার অনেক ভালোবাসা নিও। ইতি?

ইতি কি?

তোমার বীথি।

চিঠিটা পড়ার পর আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চারপেয়িটার ওপরে বসে পড়লাম। দু-পাতা ভর্তি চিঠিটা নাড়াচাড়া করতে করতে কত কি ভাবতে শুরু করলাম।

দুই

আজকাল ভাবি না। অতীত দিনের কথা, ছেলেবেলার স্মৃতি, প্রথম যৌবনের আহত বসন্তের ইতিহাস আজকাল মনে করি না। চাই না। ভালো লাগে না। কষ্ট লাগে। বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করি। নাকি জ্বালা? হয়তো জ্বালাই হবে। দারুণ জ্বালা করে।

শীতের শিশিরভেজা সকালে আম্র পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে মুকুল দেখা দেয়। লুকোচুরি করে অনেক প্রত্যাশা। অনেক সম্ভাবনা। মাঘের হিম আর বসন্তের মাতাল হাওয়ায় সে মুকুল কৈশোর অতিক্রম করে। প্রথম যৌবনে চৈত্রের রুক্ষতা গ্রাহ্য করে না। বৈশাখের বৈরাগ্যে সে পূর্ণ যৌবনের আনন্দে নাচে। কিন্তু হঠাৎ কালবৈশাখী এসে সব নষ্ট করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়। যেন নবান্নের আগে গোলায় আগুন লাগল। সারা বছরের সব মেহনত, সব স্বপ্ন এক মুহূর্তে ছারখার হয়ে গেল।

না না, ঠিক হল না। অপ্রত্যাশিত, অভাবিত দুর্ঘটনায় অনেক স্বপ্নই ধ্বংস হয়। কিন্তু এ যেন তিলে তিলে নিজেকে বিলীন করা। টাইফয়েড, কলেরা, স্মল পক্সে মৃত্যু নয়। লিউকোমিয়ায় মৃত্যু! নিশ্চিত মৃত্যু। তিলে তিলে মৃত্যু। জীবনের সাধনা নয়, মৃত্যুর আরাধনা! ব্রত পালন।

ভাবলেও আশ্চর্য লাগে কিন্তু পিছনের দিনগুলির কথা মনে হলেই আমার এই রকম যা তা মনে হয়। দিনের আলোয় ডালহৌসি স্কোয়ারের লক্ষ লোকের সামনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করা যায়। সার্থকতা আছে। কিন্তু বহরমপুর জেলের অন্ধকার 'সেল'-এ আমরণ অনশন ধর্মঘট করে চুপি চুপি মৃত্যুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কী সার্থকতা?

বিনোদবাবুর পরিবার চুপি চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে মরেছে। মরছে। সবাই এখনো মরেনি। তবে মরবে। দুদিন আগে বা দুদিন পরে। বীথি কেন বাঁচতে চাইছে?

দেওয়াল থেকে একটা টিকটিকি লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ল। একবার মাথাটা উঁচু করে কী যেন দেখল। তারপরই পাগলের মতো ছুটে গেল একটা

পোকা ধরতে। ধরল। তবে পুরোটা গিলতে পারল না। পোকাটা এখনও বাঁচার চেষ্টা করছে। আরো কিছুক্ষণ করবে। পারবে না। হেরে যাবে। মারা যাবে। টিকটিকির উদরপূর্তি করবে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল। পোকাটা হেরে গেল। টিকটিকির পেটে গেল। হয়তো পোকাটাও জানত তার পরিণতি। তবু সে বাঁচতে চেয়েছিল। চেষ্টা করেছিল। বীথিও কি এই রকমই চেষ্টা করছে? ও জানে না হেরে যাবে। হারিয়ে যাবে। স্মৃতিদি তো লড়াই করেনি? ও তো নিঃশব্দে হার মেনে নিয়েছে। স্বীকার করে নিয়েছে বিধাতার মাতলামি!

এই দিল্লিতে আঁধি উঠলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ঘর বাড়িও যেমন ধুলোয় ভরে যায়, বীথির চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার মনের আঙ্গিনাও তেমনি স্মৃতির ধুলোয় ভরে গেল। দারুণ কষ্ট হচ্ছে। জ্বালা করছে। ভয় করছে।

ভয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ভয়। ভয় করবে না?

কয়েক শতাব্দী আগে এই রাজপ্রাসাদের দরবারে বসতাম আমি। আমরা। দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাবার পর বসতাম দল বেঁধে। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে প্রেয়সীর দল ভিড় করত। নানা বেশে, নানা রঙ-এ। আসত নর্তকীর দল, আসতেন মিঞা তানসেন। গান হতো, বাজনা হতো, সুরা পান হতো। হতো প্রেয়সীর মধু পান। সারারাত। রাতের পর রাত!

সে তো কয়েক শতাব্দীর আগেকার কথা! এখন সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষে রাত্রির অন্ধকারে একা একা বিচরণ করতে ভয় করবে না?

করছে। ভয় করছে। স্মৃতিদির স্মৃতিকথা মনে করেই ভয় করছে। ভয় করছে পুরনো দিনের আরো অনেক কথা মনে করে। কিন্তু শৈশবে বা কৈশোরে ভয় করত না। ভালো লাগত। বেশ ভালো লাগত।

'মছিমা মিত্তি দেবে না?' আমি মাসিমার কাছে আবদার করতাম।

মাসিমা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, নিশ্চয়ই দেব বাবা! তোমার জন্যই তো মিত্তি করেছি।

ছেলেবেলায় আমি বেশ গোল-গাল ছিলাম। খুব আধো আধো কথা বলতাম। তবে ভীষণ দুরন্ত ছিলাম। মা আমাকে সামলাতে হিমশিম খেতেন। অনেকদিন ধরেই অনেকে ভেবেছিলেন মার কোনো ছেলেমেয়ে হবে না। আমি যখন হলাম তখন মা বেশ মোটা হয়েছেন। বয়সও হয়েছে। আমার

সঙ্গে তাল রেখে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাইতো আমি মাসিমার কাছেই সারাদিন থাকতাম। খুব ছেলেবেলা থেকেই থাকতাম।

মাসিমার কাছে থাকার আরো অনেক কারণ ছিল। আমার মামার বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো ছিল। এখনও ভালো। আমার চার মামা। মা বাড়ির সব চাইতে ছোটও। সেজন্য বেশ আদুরে। ছোট ভাই-বোন না থাকায়, কোনো বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা সহ্য করেননি। তাই মা আমাকে ঠিক সামলাতে পারতেন না। আমার একটু কিছু হলেই ভীষণ ঘাবড়ে যেতেন। সব সময় সব কথা বাবাকে বলতে পারতেন না। ডাক দিতেন মাসিমাকে।

'দিদি, দেখছ কী ভীষণ কাঁদছে। কিছুতেই থামাতে পারছি না।'

মাসিমা সহজভাবে জবাব দিতেন, 'বোধহয় পেট ব্যথা করছে।'

'পেট ব্যথা হল কেন?'

'এত ছোট বাচ্চাদের উনিশ-বিশ হলেই পেট ব্যথা হয়।'

'তাহলে?' মা আকুল হয়ে মাসিমার মুখের দিকে চাইতেন।

'অত ঘাবড়াবার মতো কিছু হয়নি! একটু গরম সরষের তেল দাও। আমি ওর পেটে মালিশ করে দিচ্ছি।'

সত্যি, মাসিমা আমার পেটে একটু তেল মালিশ করলেই আমার কান্না থেমে যেত। 'বললাম না, পেট ব্যথা করছিল?'

মা অসহায়ের মতো বলতেন, 'ওর যে কখন কি ব্যথা করে তাতো আমি আজও বুঝতে পারলাম না।'

পরে আমি বড় হলে এসব কথা মা আর মাসিমার কাছে শুনেছি। শুনেছি আরো অনেক কথা।

আমি তখন মাত্র কয়েক মাসের। মা আমাকে স্নান করাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি কারণে একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় আমার নাকে-মুখে জল যায়। নিঃশ্বাস নিতে না পারায় আমি কষ্টে বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে মার কি কান্না! ভয়ে, আতঙ্কে মা দিশেহারা হয়ে যথারীতি মাসিমার শরণ। মাসিমা এলেন। কোলে তুলে নিয়ে একবার ভালো করে দেখেই আমার পা দুটো ধরে উঁচু করে পিঠে দু-চারটে চড়-চাপড় মারতেই আমার নাক-মুখ দিয়ে খানিকটা জল বেরিয়ে এলো।

'দিদি, আজ তুমি না থাকলে কি হতো?' যেন সে সম্ভাবনার কথা মা কল্পনাও করতে পারি না।

'কি আবার হতো। দু-এক মিনিট পরেই ঠিক হয়ে যেত।'

এত ঘন ঘন মাসিমাকে কাছে পাবার জন্য অতি শৈশবেও আমি তাঁকে ভালোবাসতাম। উনি দুটি হাত বাড়িয়ে দিলেই আমি ওঁর কাছে যেতাম, কোলে যেতাম। হাসতে হাসতে যেতাম। খুশি হয়ে যেতাম। আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে উনিও খুশি হতেন। হয়তো নিজের দুটি পুত্রকে হারাবার বিয়োগব্যথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলতে পারতেন। গীতিদি আমার চাইতে বছর খানেকের বড়। আমার মতো সেও তখন শিশু। বহু সময়ে দুজনেই একসঙ্গে কান্নাকাটি শুরু করতাম। দুজনেই একসঙ্গে মাসিমাকে টেনে ধরতাম। আরো কত কি করতাম। উনি হাসিমুখে সব অত্যাচার, ঝামেলা সহ্য করতেন আমাকে একপাশে আর গীতিদিকে আরেক পাশে নিয়েই উনি রোজ দুপুরে শুতেন। ঘুমুতেন।

একটু বড় হবার পর খেলা করতাম স্মৃতিদি, গীতিদি আর আমি। নানা রকম খেলা। সব বাচ্চারা যেমন খেলা করে, তেমনি খেলা।

'বুঝলি বেণু, আজ আমি ডাক্তার। তোরা দুজনে রুগী।'

স্মৃতিদির কথায় আমি আপত্তি করতাম না কিন্তু গীতিদি সহজে মানতে চাইত না, 'কেন? রোজ রোজ তুই কেন ডাক্তার হবি?'

'রোজ কোথায়? অনেকদিন পরে তো ডাক্তার হচ্ছি।' স্মৃতিদি বেশ রাশভারী হয়ে বোঝাত।

মাথা দোলাতে দোলাতে গীতিদি বলত, না, তা কেন হবে?

'আমি যে বড়।' যুক্তি দেখাত স্মৃতিদি।

'আমিও তো বড়।' গীতিদি তর্ক করত।

'তোর চাইতে আমি যে বড়।'

আমি চুপ করে ওদের তর্ক, ঝগড়া দেখতাম। পরে যখন হাতাহাতি হতো, তখনও আমি চুপ করেই বসে থাকতাম। অথবা দৌড়ে মাসিমার কাছে গিয়ে নালিশ করতাম, 'মাসিমা! ওরা দুজনে মারামারি করছে।'

'ওদের কাছে তোমার যেতে হবে না। তুমি আমার কাছে থাক।'

দু-এক মিনিট মাসিমার কাছে বসতাম। তারপর আর ভালো লাগত না। আবার চলে যেতাম ওদের কাছে। খেলতে। ততক্ষণে ওদের ঝগড়া মিটে গেছে। শুরু হতো আমাদের খেলা।

দড়ি আর শিশির ঢাকনা দিয়ে স্মৃতিদি স্টেথো তৈরি করত। তারপর ওষুধ। ছোট-বড় শিশিতে লাল-নীল জল। কোনো শিশিতে একটু চিনি। আরো টুকটাক কত কি! স্মৃতিদি ডাক্তারখানা সাজাবার পর বলত, 'তোরা এবার আয়।'

গীতিদি আমার হাত ধরে একটু ঘুরে ফিরে ডাক্তারখানায় হাজির হতো, 'ডাক্তারবাবু, বাবার ভীষণ অসুখ।'

স্মৃতিদি বেশ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কী হয়েছে?'

'দারুণ জ্বর।'

'আচ্ছা বাবাকে এখানে শুইয়ে দে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়তাম! ডাক্তার স্টেথো দিয়ে আমার বুক পরীক্ষা করতো, পেট টিপতো, জিভ দেখতো। 'ভয় নেই। আমার ওষুধে ঠিক হবে।'

গীতিদি হঠাৎ বলতো, তোর ওষুধে না সারলে আমি ডাক্তার হবো কিন্তু।

'আঃ। আবার ঝগড়া করছিস?'

'ঝগড়া করছি কোথায়? না আমি বলে রাখছি।'

'আচ্ছা এখন ওসব বলে না।'

স্মৃতিদির মিছিমিছি ওষুধ আমি মিছিমিছি খেতাম। আবার একটু শুয়ে পড়তাম। গীতিদি মুহূর্তের মধ্যেই জানতে চাইত, 'তোর জ্বর সেরেছে?'

'সারছে।'

উদগ্রীব হয়ে দুই বোন আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ সেকেন্ড মাত্র। তার বেশি নয়। কারুরই ধৈর্য থাকত না। গীতিদির ভয়ে স্মৃতিদিই আগে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোর জ্বর সেরে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

যদি কোনোদিন না বলতাম তাহলেই সর্বনাশ!

কোনোদিন রান্না-রান্না খেলা হতো। একজন বাজার করত, একজন রান্না করত আর একজন নেমন্তন্ন খেত। আবার কোনোদিন স্মৃতিদি মাসিমা হতো, গীতিদি হতো আমার মা। আমি? কোনোদিন স্বামী, কোনোদিন পুত্র! ওদের যা খুশি। এছাড়া বর-বৌ খেলা তো ছিলই। নিয়মিত। তিনজনের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ। সুতরাং বর হবার অধিকার ওদের ছিল না। রোজ আমি বর হতাম কিন্তু বৌ পাল্টে যেত। কোনোদিন স্মৃতিদি কোনোদিন গীতিদি। ওদের একজন বৌ, আরেকজন শাশুড়ি হতো।

স্পষ্ট মনে পড়ছে। খবরের কাগজের তৈরি টোপর মাথায় দিয়ে আমি বিয়ে করতে বসতাম। শাশুড়ি বরণ করতেন, কন্যা সম্প্রদান করতেন। তারপর মাসিমার রান্নাঘর থেকে চুরি করা চিনি, গুড়, পাটালি বা যা হোক মিষ্টি জুটতো আমার কপালে।

'চল বেণু, এবার আমরা শুতে যাই।' গীতিদি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই আমাকে বলত।

শাশুড়ি স্মৃতিদি প্রতিবাদ করত, 'এখনই শুতে যাবি কিরে? এখনও অনেক কাজ বাকি!'

'মোটেই না। সবই তো করলি।'

'বিয়ে করতে এসে কেউ তর্ক করে?'

'তর্ক করছি?'

'শাশুড়ির কথা শুনছিস?'

'সব তো শুনলাম। আর কি শুনব?'

ভাবলে অবাক হই। সেই ছেলেবেলাতেও গীতিদি জানত বিয়ে করে শুতে হয়। শুধু জানত নয়, আগ্রহ ছিল। দারুণ আগ্রহ ছিল। শুয়ে শুয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, মাঝে মাঝে আদরও করত।

মাঝে মাঝে স্মৃতিদির সঙ্গেও আমার বিয়ে হতো। বিয়ের পর আমরা দুজনে শুয়েছি কিন্তু দু-এক মিনিটের জন্য মাত্র। দুটি বোনের মধ্যে কত পার্থক্য। আমার ভীষণ ভালো লাগত স্মৃতিদিকে। আমি ওকে শ্রদ্ধা করতাম। দিদির মতো শ্রদ্ধা করতাম বরাবর। এখনও।

ও যখন স্কুলে ভর্তি হল তখন আমাকে সারাদিন গীতিদির সঙ্গে কাটাতে হতো। কখনও আমাদের বাড়িতে, কখনও ওদের বাড়িতে। খুব ভাব হয়েছিল আমাদের মধ্যে। কিন্তু ওকে কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে পারিনি। তাগিদ বোধ করিনি। অথচ ওর একটা দারুণ আকর্ষণ ছিল। প্রাণ-প্রাচুর্য ছিল। উচ্ছলতা ছিল। হয়তো আরো কিছু ছিল! আছে। আমাকে টেনে নিত। চুম্বকের মতো টেনে নিত। আমিও যেতাম। আগ্রহের সঙ্গে যেতাম। না গিয়ে পারতাম না।

একেবারে ছেলেবেলায়, তখন আমার বিচার-বুদ্ধি হয়নি। তখন ভালোই লাগত। বড় হবার পর, যখন কিছুটা ভালো-মন্দ বুঝতে শিখলাম, তখন ঠিক ভালো লাগত না। কিন্তু তবুও যেতাম। মোহের ঘোরে যেতাম। সে দারুণ মোহ। দুর্বার মোহ। ও যেন রক্ত পলাশ। দেখব না ভাবলেও দেখতে হয়। দৃষ্টি টেনে নেয়।

বীথির চিঠি পেয়ে আজ আমার এসব কথা মনে পড়ছে। বীথি আসছে। আমার কাছে আসছে। আমার কাছে থাকবে। ঘরের মধ্যে আরেকটা খাটিয়া পাতা হবে ঠিকই কিন্তু আলো অফ্ করার পরই ও আমার কাছে আসবে। ঠিক আসবে। না এসে পারবে না। আমাকে ভালো করে কাছে পাবে বলেই তো আমার এখানে

থাকবে। নয়তো ও হোটেলেই থাকতে পারত। থাকত। শুটিং শেষ হবার পর ইউনিটের আর সবাই চলে যাবার পরেও হয়তো আরো কয়েকদিন থাকবে। তখন কি করবে কে জানে! হয়তো বলবে, চল আগ্রা ঘুরে আসি। আমি অফিসের কাজের চাপের কথা বললে বিশ্বাসই করবে না। আমার দুটি হাত ধরে কাঁধের ওপর মাথা রেখে এমনভাবে বলবে যে ওর অনুরোধ রাখতেই হবে। না রেখে পারব না।

হাসি পেল। হঠাৎ। বহুদিন পর্যন্ত এই বীথিকে আমি গ্রাহ্যই করতাম না। আর আজ? আজ মনে হয় ও যেন অনেকটা কাছের মানুষ। ওকে আমি ভালোবাসি না কিন্তু মনে হয় বীথি আমাকে ভালোবাসে। সত্যি ভালোবাসে। আমাকে চায়। সারা জীবনের জন্য আমাকে চায়। অথচ অমন কেন করে? ওই শিশিরের পাল্লায় না পড়লেই কি চলছিল না। ন্যাকা ন্যাকা সেজে থাকে অথচ ওর মতো বদ লোক সারা পাড়ায় আর কেউ নেই। একথা পাড়ার সবাই জানে। তবে প্রকাশ্যে আলোচনা করে না। পিছনে করে। সবাই। রিকশাওয়ালা-পানওয়ালা থেকে শুরু করে পাড়ার সব ভদ্দর লোক ওকে চেনেন। আমিও চিনি। জানি। ভালো করেই জানি।

শিশিরদা!

আমাদের সবার শিশিরদা। রোগা শুকনো মার্কা চেহারা। চট করে বয়সটা আন্দাজ করা যায় না। তবে আমরা জানি বেশ বয়স হয়েছে। বরাবরই ওকে ওইরকম দেখছি। মনে মনে বা পিছনে যে যাই বলুক শিশিরদার আড্ডাখানায় ঘুরে ফিরে সবাইকে পাওয়া যায়।

গীতিদিই আমার সঙ্গে প্রথম শিশিরদার আলাপ করিয়ে দেয়। 'শিশিরদা, এই যে বেণু।'

'এসো, এসো।' আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি ঘরে ঢুকে চুপটি করে একটা চেয়ারে বসলাম। ছোট ঘর হলেও মোটামুটি বেশ সাজানো গোছানো। খাটের ওপর অনেকগুলো কাগজপত্র ছড়ানো। চেয়ারে বসে বসেই দেখলাম সিনেমার কাগজ। ম্যাগাজিন। দেশি বিদেশি। গীতিদি ম্যাগাজিনগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'কি শিশিরদা, সুটিং দেখাতে নিয়ে যাবেন না?'

শিশিরদা গীতিদির মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'কবে?'

'আমাদের নতুন বইটা শুরু হোক।'

'ও বই আর শুরু হয়েছে!'

'তার মানে?' বলেই উনি ডান হাত দিয়ে গীতিদিকে একটু চেপে জড়িয়ে ধরলেন।

'আজ ছ-মাস ধরেই তো বলছেন শুরু হবে, শুরু হবে কিন্তু শুরু আর হচ্ছে না।'

শিশিরদা খাটের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে থেকে একটা সিনেমা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে বললেন, আমার কথা বিশ্বাস না হয় এই নিউজটা পড়।

'নিউজ পড়ে কী হবে?'

'স্যুটিং দেখে কী হবে?'

'স্যুটিং দেখব ছাড়া কি স্যুটিং করব?'

'ইচ্ছা হলে করতেও পার।'

'আশা বা রেখার মতো বিয়ে বাড়ির ভিড়ের সিনে নেমে আমার কাজ নেই।'

আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে শিশিরদাকে ধরে যে নানা বইয়ের ক্রাউড সিনে নামত, তা আমি জানতাম। সিনেমার পর্দায় নিজের ছবি দেখে যারা কৃতিত্ব অনুভব করত, তারা এর কাছে ঘুরে বেড়াত, তাও জানতাম। তবে সিনেমা-টিনেমার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। গীতিদিরও ছিল না। আজ তাই এখানে আসাতে আমি একটু অবাক হয়েছি।

শিশিরদার বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে গীতি, তুই কি সিনেমায়...'

বেশ ভাবছিলাম কিন্তু বাধা পড়ল। ছেলেবেলায় আমি ওদের দুই বোনকেই নাম ধরে ডাকতাম। মা ডাকত যে। পরে মার বকুনি খেতে খেতে স্মৃতিদি বলা শুরু করলাম কিন্তু গীতিকে দিদি-টিদি বলতে পারতাম না। তারপর একদিন বাবার বকুনি খেলাম। সেই থেকে বাড়িতে গীতিদি বলতাম। বাইরে দুজনেই দুজনকে নাম ধরে ডাকতাম। বীথির চিঠিটা পেয়ে পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে এত মশগুল হয়ে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে আমি বাড়িতেই বসে আছি। বাবা ডাক্তারখানায় বিশ্বাসকাকুর সঙ্গে গল্প করছেন। সামনের বারান্দায় মা আর মাসিমা ফিস্ ফিস করে কি যেন খুব গোপন আলোচনা করছেন। গীতিকে তাই এতক্ষণ গীতিদি গীতিদি বলছিলাম?

হা ভগবান!...

গীতি ঠোঁট উল্টে বলল, ওসব সিনেমার ন্যাকামিতে আমি নেই।

'তবে শিশিরদার সঙ্গে এত ভাব কেন?'

'কার সঙ্গে আমার ভাব নেই বলতো?'

আমি আর কোনো জবাব দিতে পারলাম না। সত্যি ওর সঙ্গে সবার ভাব, সবার খাতির। খাতির বা জানাশুনো হবার অবশ্য কারণ ছিল। ওর বাবা বাইরে থাকতেন। বাড়িতে কোনো বড় ছেলে নেই। স্মৃতিদি আমাদের দুটো বাড়ি আর মাঝখানের ওই ছোট্ট জঙ্গলটা ছাড়া আর কিছুই জানত না। আর কোথাও যেতও না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম গীতিকেই করতে হতো।

'এই গীতি, বলাইয়ের দোকান থেকে একটু তেল আর আটা আনতে পারবি?'

'ধারে?'

'বল শনিবার তোর বাবা এলেই...'

'শনিবার বললেই বলাইদা আরো রেগে যায়।'

মাসিমা আপন মনে আনাজ কাটেন। আর কোনো কথা বলেন না। স্মৃতিদিও দরজায় হেলান দিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। আমি আর গীতি খানিকটা দূরে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না।

একটু পরে গীতি বললো, 'দিদি, তেলের বোতল আর আটার থলেটা দে তো।'

স্মৃতিদি নিঃশব্দে তেলের বোতল আর আটার থলেটা গীতির হাতে তুলে দিল।

'চলতো বেণু, একটু বলাইদার দোকান থেকে ঘুরে আসি।'

রাস্তায় এসে আমি বললাম, 'বলাইদা দেবে তো?'

'দেবে ঠিকই তবে একটু কথা শোনাবে।'

'তেল আর আটাতে কত টাকা লাগবে রে?'

'গোটা চারেক টাকা লাগবে।'

'চলতো মার কাছে যাই।'

'কেন?'

'আমি মার কাছ থেকে চারটে টাকা...'

আমাকে কথাটা শেষ করতে দিল না গীতি। 'দূর পাগল। তাই হয় নাকি?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'তাতে অনেক কিছু হয়। তাই বুঝবি না।'

'কি হয় বল না?'

গীতি হাসল।

'হাসছিস কেন?'

'তোর ছেলেমানুষী দেখে।'

'আমি ছেলেমানুষ আর তুই বুঝি খুব বুড়ি?'

'বয়সে বুড়ি না হলে কি হয়, দোকানদারদের কাছ থেকে ধার চাইতে চাইতে বুড়ি হয়ে যাচ্ছি।

'তার মানে?' আমি থমকে দাঁড়ালাম।

'তুই বুঝবি না' নির্লিপ্তভাবে ও জবাব দিল।

'খুব বুঝব। তুই বল।'

ও জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিতে নিতেই একটু ভাবল। বললো, 'তুই জানিস না মাসিমার কাছ থেকে আমরা অনেক টাকা ধার নিয়েছি।'

'না। আমি জানব কী করে?'

'আমাদের সংসারের কিছুই তুই জানিস না।' ও আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে বললো।

'সংসারের কি জানি না?'

'এই অভাব-অনটনের কথা আর কি।'

'না বললে জানব কেমন করে?'

'তোকে একদিন বলব। কাউকে বলবি না তো?'

'না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

সেদিন বলাইদা তেল আর আটা দিয়েছিল ঠিকই তবে কথাও শুনিয়েছিল। 'তোরা বড্ড জ্বালাতন শুরু করেছিস। দেখছি তোদের জন্য দোকান উঠে যাবে।'

গীতিও চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। 'যেদিন থেকে তোমার দোকানে আসছি সেদিন থেকেই তো এই কথা শুনছি।'

'যা যা বাজে বকিস না।'

দোকানে আরো তিন চারজন খদ্দের ছিল। সবাই পাড়ার লোক। ওদের সামনে বলাইদার কথাগুলো আমার ভীষণ খারাপ লাগল। গীতির হাত থেকে আটার থলিটা আমি নিয়ে বললাম, বলাইদার কথাবার্তা তো ভারি বিশ্রী।

'তবুও লোকটা ভালো।'

'ভালো?'

'ভালো না হলে ধার দেয়?'

'জানাশুনা থাকলে সব দোকানদারই ধারে দেয়।'

'দোকানদারদের তুই চিনিস না বেণু।'

শুধু দোকানদার কেন, এই সংসারের অনেক কিছুই আমি চিনতাম না, জানতাম না, বুঝতাম না। তখন সে সুযোগ আসেনি। পাইনি। আমার সঙ্গে আমার পৃথিবীর মুখোমুখি সাক্ষাৎকার তখনও হয়নি। জীবনের সঙ্গে সংসারের সংঘর্ষে যে অভিজ্ঞতা হয়, সে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। গীতির ছিল। অনেকটা ছিল। সমাজে-সংসারে গরিব আছে, বড়লোক আছে জানতাম। জানতাম না দারিদ্রের জ্বালা, সংসারের নোংরামি। গীতি আমাকে চিনিয়েছিল, আস্তে আস্তে চিনিয়েছিল! অনেক কিছু। ও আমাকে এত কিছু শেখাবে, জানাবে সেদিন কল্পনা করিনি। যা কল্পনাতীত তাইতো জীবন! তাইতো সংসার।

তিন

মেডিক্যাল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় বাবার বিয়ে হয়। আমার বড়লোক দাদু ডাক্তার জামাই পাবার লোভে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা ডাক্তার হয়েছেন। অ্যালোপেথিক নয়, হোমিওপ্যাথিক। এম. বি নয়, এইচ. এম. বি। বাবা থার্ড ইয়ারে ওঠার পরই ঠাকুরদাদা শুধু মারা গেলেনই না সারা পরিবারকে মেরেও গেলেন।

সে এক ইতিহাস। দীর্ঘ ইতিহাস। নতুন কিছু নয়, তবু ইতিহাস। ইতিহাস কি নতুন হয়? বোধহয় নয়। উত্থান আর পতন। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর বিপর্যয়। এক অধ্যায়ে সম্পদ, সম্ভোগ, অন্য অধ্যায়ে শুধু বাঁচার সংগ্রাম। জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম। রাজা-মহারাজা-সাম্রাজ্যের মতো প্রতিটি পরিবারেরই এই কাহিনি। এই ইতিহাস। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের পাড়ার চারিদিকে তাকালেই ইতিহাসের ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের স্কুলের অঙ্কের টিচার বলাইবাবু তো উজিরপুরের জমিদারের ছোট ছেলে। স্কুলের চাকরি ছাড়াও বাড়িতে কোচিং ক্লাশ খুলেছেন। ওর একার আয়ে সারা পরিবারটি বেঁচে আছে। বলাইবাবুর কোচিং ক্লাশে আমিও গেছি। সপ্তাহে দু-দিন। মাসের শেষে পনেরো টাকা। মাসের প্রথমের দিকে সব ছাত্ররাই ওর হাতে টাকা তুলে দিত। দিতাম না আমি। মা কখনও আমার হাত দিয়ে টাকা পাঠাতেন না। নিজে যেতেন। প্রত্যেক মাসে।

বেশ চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ির পরে, আঁচলে চাবির গোছা ঝুলিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মা যেতেন। হাতের মুঠোয় থাকত বাবার ডিসপেন্সারির একটা ছোট্ট খাম। খামের মধ্যে থাকত পনেরটি টাকা। মা একলা যেতেন না। সঙ্গে থাকত টেনু।

বলাইবাবুর মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন আছেন মাসিমা?'

'এইত বৌমা, কোনোমতে বেঁচে আছি।'

'কেন হাঁপানির কষ্টটা বেড়েছে নাকি?'

'দিনের বেলায় তো ভালোই থাকি কিন্তু রাতের দিকে বড্ড কষ্ট হয়।

কিছুতেই ঘুমুতে পারি না।'

'কোনো ওষুধ-টষুধ খাচ্ছেন?'

'রোগভোগের কথা ছাড়। সব সময় ওইসব কথা বলতে ভালো লাগে না...'

'তাই বলে অসুখ হলে ওষুধ না খেলে চলে?'

বলাইবাবুর মার সঙ্গে মা গল্প করতেন। নানা বিষয়ে।

'আচ্ছা বৌমা, বিনোদের কী খবর?'

'বড় ঠাকুরপোর কথা আর বলবেন না!'

'কেন বল তো?'

'বেচারা সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। দেখে বড় কষ্ট হয় অথচ আমরাই বা কী করতে পারি?'

'তবু তো তুমি যথেষ্ট কর।'

'না না, কোথায় যথেষ্ট করি? ইচ্ছা থাকলেও তো করে উঠতে পারি না।'

'সে কি আর আর আমি বুঝি না? খুব বুঝি। তবে বিনোদের বৌ তো বলে তোমরা না থাকলে ওদের সংসার বহুকাল আগেই অচল হয়ে যেতো।'

'ছাড়ুন মাসিমা! দিদির কথা আর বলবেন না।'

এরই ফাঁকে টেনুর হাতে দুটো বিস্কুট আর মার কাছে এক কাপ চা এসেছে। বলাইবাবুর বৌদি বা কোনো ভাইঝি দিয়ে গেছে। আগে মা আপত্তি করতেন, পরে করতেন না। জানতেন এটা উজিরপুর জমিদার বাড়ির ধারা। ঐতিহ্য। অতিথিকে কিছু দিতে হয়। আপ্যায়ন করতে হয়।

বাড়ি ফেরার আগে মা ওদের বাইরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকতেন, ঠাকুরপো!

বলাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, 'ওঃ! বৌদি!'

'একটু শুনুন।'

উনি দরজার কাছে আসতেই মা ডিসপেন্সারির ছাপ দেওয়া ছোট খামটা এগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'বেণু পড়াশুনা করছে তো?'

খামটা হাতের মধ্যে নিয়ে বলাইবাবু হাসিমুখে বলতেন, 'অন্তত, অঙ্কের চিন্তা নেই।'

'আচ্ছা আজ চলি। একদিন আসবেন।'

'আসব।'

এই বলাইবাবুর বাবা বিয়ে করতে গিয়েছিলেন হাতিতে চড়ে। শুধু বর

নয় বরযাত্রীরাও গিয়েছিলেন হাতিতে চড়ে। স্কুলের খেলার মাঠ বরযাত্রীদের তাঁবুতে ছেয়ে গিয়েছিল। এই বরযাত্রীদের দেখাশুনার জন্য শতখানেক কর্মচারী এসেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট লংম্যানও একজন বরযাত্রী ছিলেন। ওঁর খানা-পিনার জন্য কলকাতা থেকে ইংরেজি জানা বাবুর্চি-খানসামা আনা হয়েছিল।

'জান বৌমা, বলতে লজ্জাও করে, ঘেন্নাও করে। দু-দিনে বরযাত্রীরা দশ হাজার টাকার মদ খেয়েছিলেন। নাচ দেখাবার জন্য পাঁচজন নামকরা বাঈজি এনেছিলেন কাশী থেকে...'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? সব কিছু শুনলে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না।'

'আরো বুঝি অনেক কিছু হয়েছিল?'

'কি হয়নি? বিয়ের পরই কর্তা চলে গেলেন তাঁবুতে...'

'কেন?'

'ওখানে যে বাঈজিরা ছিল...'

'তাই বলে বিয়ের রাতে?'

'নিশ্চয়ই। ওরা যে জমিদার! উৎসবের রাতে বাঈজির নাচ না দেখলে ওদের সম্মান নষ্ট হয়।'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হা ভগবান।'

বৃদ্ধা একটু মুচকি হেসে বললেন, 'দাঁড়াও বৌমা, এখনই ভগবানকে ডেকো না। নাচ দেখে এক বাঈজীকে নিয়েই শুয়েছিলেন। আর ওই লংম্যান সাহেব কী করেছিলেন, শুনবে?'

'কী?'

'বিয়ে দেখতে এসেই ওর নজর পড়ল আমার ছোটমাসির উপর। তাঁবুতে ফেরার সময় ছোটমাসিকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন...'

'সে কী?'

'হ্যাঁ বৌমা। ছোটমাসিকে বেশ খানিকটা মদও খাইয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর এগুতে পারেননি। কর্তা সাহেবকে বাঈজিদের নাচ দেখবার জন্য নিজের তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মাসিকে নেবার সময় কেউ বাধা দিলেন না?'

'কি বলছ বৌমা? জমিদারবাবুরা যদি রেগে যেতেন? যদি বিয়ে বন্ধ করে দিতেন? তাহলে?...'

'তাই বলে...'

'একে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার উপর বড় বাড়ির বরযাত্রী। কে বাধা দেবে? অসম্ভব বৌমা, অসম্ভব!'

বৃদ্ধার সঙ্গে মার ভাব। হবার কারণও আছে। আগে আমাদের ও বলাইবাবুদের বাড়ির মাঝে আর কোনো বাড়ি ছিল না। নতুন বাড়িতে সংসার শুরু করতে গিয়ে পদে পদে সমস্যা এসেছিল আমাদের। মাসিমাদের। এই দুটি পরিবারকে সাহায্য করতে ওরা বার বার এগিয়ে এসেছেন।

আরও একটা কারণ আছে। বাবা খুব নামকরা ডাক্তার না হলেও বাচ্চাদের আর মেয়েদের চিকিৎসা ভালোই করেন। বলাইবাবুর এক ছোট ভাইপোকে বাবা প্রায় মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনেন। বাচ্চাটি সুস্থ হবার দু-একদিন পর বলাইবাবু বাবাকে কিছু টাকা দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু বাবা কিছুতেই নিলেন না। শেষে বৃদ্ধা এসে বলবেন, সুধীর, এটা ফিরিয়ে দিও না বাবা। তুমি যা করলে তার বিনিময়ে এটা কিছুই না। তবুও...

বাবা বলেছিলেন, ওকথা বলবেন না মাসিমা! তার চাইতে একটু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন। এর চাইতে দামি ভিজিট তো হয় না মাসিমা!

বৃদ্ধা প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। 'সব কিছু হারাবার পর তোমাদের মতো ছেলে-বৌ পেয়েছি বলেই তো বেঁচে আছি।'

এত রঙিন রসাল না হলেও বহু পরিবারই এমন উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে? নাকি থমকে দাঁড়িয়েছে? নাকি আরো পতনের দিকে এগুচ্ছে? সব পরিবারে কি বলাইবাবু থাকে? এমন করে পশুর মতো পরিশ্রম করে সারা পরিবারকে বাঁচাতে সবাই পারে না। চায় না।

কেন ওই যে পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি? সারা ফরিদপুর জেলায় নাকি ওঁর মতো পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। চণ্ডীতলায় আসার পরও কত জ্ঞানীগুণী নামকরা লোকের ভিড় হতো পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে। একবার তো আনন্দবাজারে ওঁকে নিয়ে কত কি লেখা হয়। ছবিও ছাপানো হয়। অথচ অত বড়লোকের ছেলেমেয়েগুলো কী হল? দুটো ছেলেই কলকারখানায় কুলি-মজুরের কাজ করে। ছোট ছেলেটা তো এক নম্বরের নেশাখোর, বদমাইস। আর মেয়ে তিনটি?

শুধু পণ্ডিত মশায়ের নয়, সারা পাড়ার কলঙ্ক ছিল। উমাদি তো ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। পণ্ডিত মশায়ের এই বড় বাবাজীবন আগে রিকশা চালালেও পরে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান করে। কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবার আনন্দ সহ্য করতে পারলেন না

ওই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানুষটি। দেহ রাখলেন কয়েক মাসের মধ্যেই।

ভালোই হল। তা নয়তো আরো অনেক কিছু দেখতে হতো ওঁকে। ছেলেরা কারখানায় কাজ করে। তাও আবার কাশীপুরের ওদিকে। যাতায়াতে অনেক সময় লাগে। তারপর শিফট ডিউটি। কখনও দিনে, কখনও রাতে। বহু সময় দুই ভাইই বাইরে থাকত। বাড়িতে থাকত দুই বোন। উত্তরা আর উর্বশী।

প্রথম প্রথম বারান্দায় বসে পা দোলাতে দোলাতে রাস্তার লোকজন দেখত, পাড়ার ছেলেমেয়েদের দেখত। কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার ছেলেরা ওদের দেখতে শুরু করল। শুধু দেখে আর কতদিন পেট ভরে? কেউ শিস্ দেয়, কেউ চোখে চোখে ইসারা করে। কেউ জানাশুনা, কেউ অপরিচিত।

তারপর?

প্রথমে মন্তব্য, তারপর আলাপ। তারপর ওই বারান্দার ধারে বসে দাঁড়িয়ে একটু আধটু গল্প গুজব। সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি! যারা পানের নেশা করতে চায় তারা কি জর্দা না খেয়ে থাকতে পারে? ঠাট্টা-ইয়ার্কির জন্যই তো এতদিনের প্রস্তুতি! নিশ্চয়ই উভয় পক্ষে।

পণ্ডিত মশায়ের মৃত্যুর ছ-মাসের মধ্যেই আবার ওই বাড়ি জমজমাট হয়ে উঠল। বহুজনের আগমনে আবার স্মরণীয় হয়ে উঠল। তবে এখন যারা আসত তারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে আসত না। আসত উত্তরা আর উর্বশীর আকর্ষণে। মধুর লোভে। দূরের বন্ধুরাও আসত। আসত দাদাদের সহকর্মীরা। সবাই নাকি তাস খেলতে আসত। হরতন-রুইতন-ইসকাবন খেলত। সৃষ্টির আদিমতম খেলা। চির নতুন। চির পুরাতন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে জুটে যেত হরতনের বিবি, রুইতনের বিবি। টেক্কা পেত, কে টেক্কা মারত, তা বাইরে থেকে জানা না গেলেও অনুমান করা যেত।

পাড়ার অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন, রাবণের চিতার আগুন নিভলেও ওদের বাড়ির তাসের আড্ডা কোনোদিন বন্ধ হবে না। কিন্তু বছর দুই পরে সত্যি সত্যি বন্ধ হল। পাড়ার লোকে ধরতে পারল না, বুঝতে পারল না কি হল।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। আমি কলেজ থেকে সোজা খেলার মাঠে গেছি। রাজস্থান-এরিয়ান্সের খেলা। ভালো খেলা। টিপ টিপ বৃষ্টি সত্ত্বেও গেলাম। কিন্তু খেলার শেষে মাঠ থেকে বেরুবার পরই দারুণ জোরে বৃষ্টি এলো। দৌড়ে গেলাম ভবানীপুর টেন্টের কাছের এক গাছতলায়। আশ্রয় নিলাম। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু লাভ হল না। ভিজে গেলাম। একেবারে ভিজে গেলাম।

বৃষ্টিটা একটু কমলে বাস স্টপের ওখানে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। বাসে ওঠা অসম্ভব। বই-খাতা জামা-প্যান্ট সব ভিজে জব জব করছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ভাবলাম একটু চা খাই। গরম হওয়া যাবে। বাস স্টপ ছেড়ে সুরেন বাড়ুয্যে রোডে ঢুকলাম। অনাদি-টনাদিতে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। ওই দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় মোগলাই পরটার বন্ধ ভেসে এলো নাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার ক্ষিদে পেয়েছে। সামনেই একটা ফাঁকা রেস্তরাঁয় প্রায় একলাফ দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

এখানেও ভিড়। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম বসার জায়গা নেই। কাউন্টারের মোটা লোকটা বলল, যান উপরে চলে যান।

দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে মেয়েদের সার্ভ করতে দেখে ভালো লাগল না, কিন্তু তবুও বেরিয়ে যেতে পারলাম না। কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা ক্ষিদের জ্বালায়। কোণার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। সত্যি ফাঁকা। শুধু একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা চা খাচ্ছিলেন। আমি একটা কোণার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

'কি ব্যাপার? তুমি?'

একেবারে কানের কাছে। মেয়ের গলা। চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি পণ্ডিত মশাইয়ের ছোট মেয়ে উর্বশী! অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

'এমন করে ভিজে গেলে কি করে?'

আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। বললাম, 'খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তাই বলে এমন করে ভিজতে হয়? কোথাও একটু দাঁড়াতে পারলে না?'

'কোথায় দাঁড়াব?'

উর্বশী একটু ভাবল। তারপর বললো, 'এসো এদিকে এসো।'

'কোথায়?'

'এই কেবিনে এসো।'

উর্বশীর সঙ্গে কেবিনের ভিতরে যাওয়াটা খুব গৌরবের বা আনন্দের নয়। প্রত্যাখ্যান করলাম। 'এখানেই ঠিক আছি।'

'ভিতরে গিয়ে গা-হাত-পা একটু মুছে-টুছে নাও।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। এক কাপ চা খেয়েই বাড়ি পালাব।'

'বাড়ি যাওয়া বললেই কি যাওয়া? এই বৃষ্টির পর ঘণ্টাখানেক কোনো ট্রামে-বাসে উঠতে পারবে না...'

উর্বশী ঠিকই বলেছিল কিন্তু তবুও আমি বললাম, না, ঠিক চলে যাব।

'এই ভেজা জামা-প্যান্ট পরে? অসুখে পড়বে যে!'

'অত সহজে আমার অসুখ হয় না।'

'হয় কি না হয় তা পরে দেখা যাবে। এখন এসো। গায়ের জল মুছে নাও।'

কতক্ষণ তর্ক করা যায়? উর্বশীর পিছনে পিছনে কেবিনে ঢুকলাম। রেস্তরাঁর পরিচিত ধরনের চারটে চেয়ার আর টেবিলের কেবিন নয়। গদী দেওয়া লম্বা চওড়া বেঞ্চি। একদিকেই। পাশে একটা সেন্টার টেবিল। আয়না আছে, ফ্যান আছে। এক কথায় বেশ সুন্দর। এই ধরনের নোংরা রেস্তরাঁয় যে এত সুন্দর কেবিন থাকতে পারে, ভাবা যায় না। আমি ভাবিনি।

উর্বশী কেবিনে ঢুকেই কোণার ব্রাকেট থেকে একটা তোয়ালে পাড়ল। পাখার সুইচ দিল। 'নাও জামা-টামা খুলে তোয়ালে দিয়ে গা-টা ভালো করে মুছে নাও।'

'কেউ কিছু মনে করবেন না তো?'

কেউ কিছু মনে করবে না। তুমি ভালো ভাবে পা-টা মুছে নাও। আমি চাটা আনছি।'

আমি কিছু বলার আগেই উর্বশী পর্দা টেনে বেরিয়ে গেল। সার্ট আর গেঞ্জি খুলে তোয়ালে দিয়ে গায়ের জল মুছে নিলাম। তারপর সার্ট আর গেঞ্জিটাকে পাখার সামনে ধরলাম। ফুল স্পিডে পাখা চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে। সত্যি শুকিয়ে গেল। কিন্তু প্যান্টটা ভিজে চপ চপ করছে। প্যান্টটা খুলে, আন্ডারওয়ার পরে, শুকিয়ে নিতে পারলে ভীষণ ভালো হতো কিন্তু তা কি সম্ভব? তবে পাখাটাকে যতটা সম্ভব টেনে নীচের দিকে করে নিলাম। তারপর বেঞ্চের উপর দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, প্যান্টে বেশ পাখার হাওয়া লাগছে। ভিতরে ঠাণ্ডা লাগছে। কিন্তু কি করা যাবে?

পর্দা সরিয়ে উর্বশী এলো। হাতে দুধের গেলাস, প্লেটে দুটো চপ।

'কি জামা-টামা শুকিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'প্যান্ট শুকোচ্ছ?'

'চেষ্টা করছি।'

উর্বশী হাসল। 'নাও গরম গরম দুধটা খেয়ে নাও।'

'দুধ খাব কেন?

'এত বৃষ্টিতে ভেজার পর গরম দুধ খেলে ভালোই লাগবে।'

'দুধ লাগবে কেন? চা খেলেই হবে।'

'আগে দুধ খেয়ে নাও। পরে চপ খেয়ে চা খেয়ো।'

রেস্তরাঁর মধ্যে বেশি তর্ক করা যায় না। করলাম না। ওর হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিলাম।

'দাঁড়িয়ে কেন? বসো।'

বসলাম। উর্বশীও আমার পাশে বসল। আমি দুধের গেলাসে চুমুক দিলাম।

'একি? মাথা থেকে যে টপ টপ করে জল পড়ছে!'

আমি কিছু বলার আগেই ও তোয়ালে নিয়ে বললো, 'ঘুরে বসো।'

বসলাম। ও তোয়ালে দিয়ে গলার পিঠের জল মুছিয়ে দিল। ভালো লাগল। ভীষণ ভালো লাগল! সঙ্গে সঙ্গে দারুণ লজ্জা পেলাম। 'থাক থাক হয়েছে। এক্ষুনি বাড়ি যাব।'

'কেন? এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?'

'মা ভীষণ চিন্তা করবেন।'

'উনি বেশ বুঝতে পারছেন বৃষ্টির জন্য আসতে পারছ না।'

'তা ঠিক তবুও...

'তুমি খাও। আমি চা নিয়ে আসি।'

ও পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি চপ খেতে খেতে ওর কথা না ভেবে পারলাম না। নানাজনের কাছে শুনেছি এইসব রেস্তরাঁর মেয়েদের দিয়ে অনেক নোংরামী করানো হয়। উর্বশীও কি এইসব নোংরামীতে অংশ নেয়? নাকি শুধু পেটের তাগিদে চাকরি করা?

আবার পর্দা সরিয়ে দু-হাতে দু-কাপ চা নিয়ে উর্বশী এলো। আমার পাশে বসল। হঠাৎ ঝুপ করে একেবারে পাশে বসল। আমার হাঁটুর সঙ্গে ওর হাঁটু লেগে গেল। ও আমার ভেজা প্যান্টের ওপর হাত দিয়ে বললো, প্যান্টটা যে দারুণ ভেজা!

'ওতে কিছু হবে না।'

'যদি জ্বর হয়?'

'তোমাকে দোষারোপ করব না!'

ও হাসল। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবতে পারনি আমাকে এখানে দেখতে পাবে?'

'না।'

'খুব অবাক হয়েছ?'

'অপ্রত্যাশিত ঠিকই তবে অবাক হইনি।'

চা খাওয়া হল। বললাম, 'এবার আমি উঠি।'

'আমিও উঠব!'

'বাড়ি যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'রোজই কি এই সময় বাড়ি যাও?'

'না। তবে আজ বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর তুমি এসেছ তাই...'

'তোমার মালিক কিছু বলবেন না?'

'না। ওকে বলেছি।'

'কী বলেছ?'

'বলেছি তোমার সঙ্গে বাড়ি ফিরব।'

'উনি কিছু ভাববেন না?'

উর্বশী একটু হাসল। 'না না, কী ভাববেন?'

ও না না বললেও আমার একটু লজ্জা করল। নানা কারণে। একটু খারাপও লাগল। হয়তো উনি আমাকে খারাপ ভাবলেন। হয়তো ভাবলেন উর্বশীর সঙ্গে আমার কোনো বিশেষ সম্পর্ক আছে। ভাবতে ভাবতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি। সিঁড়ির সামনের টেবিলেই একজন ভদ্রলোক বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স হবে। মোটামুটি ভালোই দেখতে। উর্বশী ওর পাশে দাঁড়িয়ে বললো, বাবুজি, এ তো আমাদের ডাক্তারবাবুর ছেলে।

দুজনেই একসঙ্গে হাত তুলে নমস্কার করলাম।

'খুব ভালো ছেলে। দারুণ রেজাল্ট করে।' উর্বশী হঠাৎ আমার প্রশংসা শুরু করায় অবাক হলাম।

'তাই নাকি? খুব ভালো কথা। বসুন।' মালিক বললেন।

'অনেক রাত হয়েছে। এবার বাড়ি যাব।'

'আবার আসবেন।'

'আসব।'

আমি এগিয়ে গেলাম। উর্বশী আমার পিছনে। কাউন্টারের কাছে গিয়ে মোটা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত হয়েছে?'

ও হেসে বলল, 'কিছু হয়নি।'

'কেন?'

পাশ থেকে মালিক বললেন, 'আরে কী বলছেন?'

কী আর করব। নমস্কার করের ধন্যবাদ জানিয়ে দোকানের বাইরে পা বাড়ালাম। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাতটা বাজে। এতক্ষণ ঘড়ি দেখিনি। ভাবছিলাম অনেক রাত হয়েছে। এখন অনেকটা নিশ্চিত হলাম।

হঠাৎ মনে হল উর্বশীর সঙ্গে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? এই সন্ধেবেলায় পাড়ার অনেকেই হয়তো চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। তাদের মধ্যে যদি কেউ দেখে? যদি খুব জানাশুনা কেউ দেখে? কী ভাববে? সন্দেহ করবে? বাড়িতে যদি কিছু বলে দেয়?

কি আশ্চর্য! এরই মধ্যে ওর সব উপকার ভুলে গেলাম। কে কি ভাববে, ভাবতে পারে বলে অকৃতজ্ঞ হবো কেন? উর্বশী ভালো না জানি। সে তো আমার কোনো ক্ষতি করেনি? তবে কেন ওকে ছেড়ে পালাব? বাড়িতে যদি কেউ কিছু বলে বলুক। মাকে আমিও বলব। বলব ও আমার কি উপকার করেছে।

তাছাড়া...

ভাবতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। মনে মনে। উর্বশী পাশে। ও কিছু বুঝতে পারছে না আমি ওকে নিয়ে কি ভাবছি। ওকে দেখতে বেশ ভালো। আমি একবার ওকে দেখে নিলাম। এক ঝলক। তবুও বেশ লাগল। এমন একজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে ভালো লাগবে না? বিশেষ করে আমার এই বয়সে ওর মতো একজন মেয়েকে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তাছাড়া...

তাছাড়া আবার কি?

যারা বহু আলোচিত, বহু নিন্দিত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে বৈকি। চোর-ডাকাতকে যত ঘেন্নাই করা যাক, চোর-ডাকাতকে দেখতে, পাশে পেতে নিশ্চয়ই মজা লাগে। ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে যদি কাছে পাওয়া যায় তাহলে বেশ মজা লাগে না? একশ'বার লাগে। উর্বশীকে কাছে পেয়েও আমার বেশ লাগছে।

'খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চাও?' উর্বশী প্রশ্ন করল।

'কেন?'

'তাড়াতাড়ি না থাকলে একটু ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে ফিরতাম।

'না। তেমন তাড়াতাড়ি কিছু নেই।'

'তাহলে চলো একটু বেড়াই। অনেক দিন বেড়াতে পারি না।'

'কেন? রোজই তো তুমি এ পাড়ায় আস।'

'আসি ঠিকই তবে চাকরি করতে, টাকা রোজগার করতে।'

'আজকের মতো অন্যদিন তাড়াতাড়ি বেরুতে পার না?'

উর্বশী হাসল। জবাব দিল না।

'হাসছ যে?'

'উত্তরটা শুনলে কি তোমার ভালো লাগবে?'

'খারাপ লাগবে কেন?'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। এত বলার কি আছে?'

'বেড়াই, তবে বাবুর সঙ্গে।'

হঠাৎ বুঝতে পারিনি। 'বাবুর সঙ্গে মানে?'

'আমার ওই মালিকের সঙ্গে।'

আমি চুপ করে রইলাম। লিন্ডসে স্ট্রিট ফ্রি স্কুল স্ট্রিট পার হয়ে পার্ক স্ট্রিটে পড়লাম।

আমাকে নীরব দেখে ও জানতে চাইল, 'বুঝলে কিছু?'

'কী বুঝব?'

ও আবার হাসল।

'কী ব্যাপার? আবার হাসছ?'

হাসতে হাসতেই বলল, এ চাকরিতে মাঝে মাঝেই বাবুর সঙ্গে বেড়াতে হয়। বাবুকে খুশি করতে হয়।

ও একটু থামল। একবার আমাকে দেখল। বলল 'বুঝলে?'

'বুঝলাম বৈকি! আমি তো কচি নই। কলেজে পড়ি। অনেক কিছু শুনি। কিছু কিছু দেখি। বুঝব না কেন?'

'অনেকদিন নিজের ইচ্ছে মতন ঘুরতে পারি না বলেই তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।'

লাউডন স্ট্রিটের মোড়ে এসে গেছি। রাস্তা বেশ ফাঁকা। আমি চুপ করে ওর পাশে পাশে হাঁটছি। হঠাৎ ও আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, তুমি 'রাগ করলে না তো বেণু?'

'না না, রাগ করব কেন?'

'খারাপ লাগছে?'

হাসলাম। 'খারাপ লাগবে কেন?'

'আমার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছ বলে?'

'তোমার সঙ্গে ঘুরতে খারাপ লাগবে কেন?'

'পাড়ার মধ্যে তো বিশেষ মেলামেশা কর না, তাই আর কি...'

কি জবাব দেব। বলতে তো পারি না পাড়ায় তোমাদের দারুণ বদনাম। তোমাদের বাড়ি তো রঙ্গশালা! আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। বললাম, পড়াশুনার বড় চাপ। আজকাল কোথাও যাই না।

'তাছাড়া তোমার মতো ছেলের পক্ষে আমাদের বাড়িতে আসা পোষাবে কেন?'

'একথা বলছ কেন?'

'ঠিকই বলছি। আমাদের বাড়িতে তো কোনো শিক্ষিত ভদ্র ছেলে আসে না। আসতে পারে না।'

'এসব কথা বলার কোনো অর্থ হয়?'

উর্বশী তখনও আমার হাতটা ধরে আছে হাতের মুঠোর মধ্যে। আমিও ওর হাতটা চেপে না ধরে পারলাম না। ইচ্ছা করল। খুব ইচ্ছা করল। ইচ্ছা করল আরো অনেক কিছু। প্রকাশ করলাম না। প্রকাশ করলাম না আমার সমবেদনার কথা। জীবনে ভদ্র, শিক্ষিত ছেলেদের সাহচর্য না পাবার জন্য ওর মনে যে দুঃখ জমে আছে তার জন্য সমবেদনা বোধ না করে পারলাম না।

ভালো হবার স্বপ্ন সবার মনেই থাকে। সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর জীবন সবাই চায়। উর্বশীও নিশ্চয় চেয়েছিল। আশা করেছিল পড়াশোনা করবে, সুন্দর-শিক্ষিত ছেলেকে বিয়ে করবে। হল না। ভাইদের মতো এদেরও জীবন-পথ নোংরা অন্ধকার গলিতে এসে ঢুকে পড়েছে।

'জানো বেণু, আমার খুব ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হবো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই হল না। দাদারাও পড়াশুনা করল না, আমাদেরও কিছু করতে সুযোগ দিল না।'

আমি চুপ করে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই চাকরিতে ঢুকলে কী করে?'

'খাওয়া-পরার জন্য দাদারা এত বেশি কথা শোনাতে শুরু করল যে এই চাকরি না নিয়ে পারলাম না।'

অনেকটা হেঁটেছি। টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া রাত হয়েছে। বেশি দেরি হলে বকবেন না ঠিকই তবে মা নিশ্চয়ই ভাবছেন। তাছাড়া

লোয়ার সার্কুলার রোডে এসে গেছি। ডান দিকে গেলে ট্রাম-বাস পাওয়া যাবে। বললাম হাঁটতে হাঁটতে টায়ার্ড হয়েছ?

'কেন, তুমি টায়ার্ড হয়েছ?'

'টায়ার্ড হইনি, তবে রাত হচ্ছে তো। তোমার দাদারা কিছু ভাবতে পারেন।'

ও থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি বললে, দাদারা ভাববে? সারা রাত বাইরে থাকলেও ওরা কিছু ভাববে না।'

কথাটা বিশ্বাস হল না। 'দূর পাগল! তা হয় নাকি?'

আমাকে চম্‌কে দিয়ে ও আমার বুকে হাত দিয়ে বলল, তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি 'বিশ্বাস কর দাদারা চায় বা বোনেরা বাড়ি ফিরে যায়।'

কি বলব! মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুল না। চুপ করে হাঁটতে লাগলাম। খানিক দূর যাবার পরই আবার বৃষ্টি শুরু হল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দারুণ মেঘ হয়েছে। কিছুক্ষণ বেশ বৃষ্টি বন্ধ ছিল। আবার শুরু হল। না জানি কখন এ বৃষ্টি থামবে।

বৃষ্টি পড়ছে। তবু হাঁটছি। কিন্তু আস্তে আস্তে বৃষ্টিটা জোরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

উর্বশী বলল, দেরি 'করে বাড়ি ফিরলে কি তোমার অসুবিধা হবে?'

'কেন?'

'তাহলে একটা রিকশা নিতাম। তারপর হাজরার মোড়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি করে সোজা বাড়ি যেতাম।'

দেরি হচ্ছিল ঠিকই, তবে প্রস্তাবটা বেশ মুখরোচক মনে হল। তাছাড়া এতক্ষণ ওর সঙ্গে কাটিয়ে ওকে বেশ লাগছে। এইতো ভালো লাগার বয়স। তাছাড়া...

ভাবতে গিয়েও লজ্জা করল। নিজের মনে মনেই লজ্জা পেলাম। এই বয়সেই আমি পেয়েছি। গীতিকে পেয়েছি। পাই। মাঝে মাঝেই। না না, ভুল হল। গীতি আমাকে পেয়েছে। ওর ইচ্ছা হলেই আমাকে পায়। দুজনের কেউ কাউকে ভালোবাসি না। শুধু ঘনিষ্ঠতা আছে। ঘনিষ্ঠতা হতে হতেই ও হঠাৎ একদিন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রথমে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দু-তিন দিন ওদের বাড়ি যেতে পারিনি। কারুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারছিলাম না। কদিন পরে, ঠিক সন্ধে ঘুরে যাবার পর গীতি আমাদের বাড়ি এলো। 'মাসিমা বেণু কোথায়?'

মা জবাব দিলেন, 'কেন? ওর ঘর নেই?'

টেনু মার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'দাদা তো পড়ছে।'

'যা তো টেনু। বেণুকে বল মা ডাকছে।'

টেনু এসে আমাকে খবর দেবার পর কিছুক্ষণ ভাবলাম। ভাবলাম মাসিমা কোনোরকমে টের পাননি তো? না, না। তাহলে আগেই ডেকে পাঠাতেন। এখন নিশ্চয়ই কোনো কাজে ডাকছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললাম, 'মা, আমি মাসিমার কাছ থেকে আসছি।'

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে লাফ দিলে নালাটা পার হয়ে দু-এক পা এগোতেই গীতি ডাকল, 'এই বেণু।'

'কে?' গলার স্বর পরিচিত হলেও জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি। চিনতে পারছিস না?'

'কী ব্যাপার? মাসিমা ডাকছেন?'

'না।'

'তবে কে ডাকছে?'

'আমি।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ আমি।'

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ও আমার কাছে এগিয়ে এসে হাত দুটো ধরে একটু ওধারে নিল। তারপর দু-হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কদিন আসিস না কেন?'

'এমনি। তুইও তো আসিস না।'

'তুই রাগ করেছিস?'

'রাগ করিনি, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'তুই ঠিক করিসনি।'

'একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবি?'

'বল।'

তোকে না পেলে, তোর কাছে এসে দুর্বলতা প্রকাশ করতে না পারলে হয়তো আমি খুব খারাপ হয়ে যেতাম। খারাপ না হয়ে পারতাম না।'

'কেন?'

'সে অনেক কথা। আজ সময় নেই। পরে বলব। তখন তুই বুঝবি।'

আমি পাথরের মতো ওই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ও তখনও দু-হাত

দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে আছে। আমি কোনো কথা বলছি না। বলতে পারছি না।

'কথা বলবি না?'

'কি বলব?'

'কিছুই বলবি না?'

'না। কি আর বলব?'

'তাহলে নিশ্চয়ই তুই রাগ করেছিস।'

'রাগ করিনি তবে ভাবছি কাজটা ভালো হয়নি। তাছাড়া ভয় ভয় করছে।'

'কেন? কিসের ভয়?'

'কেউ যদি কিছু জেনে যায়?'

'দূর পাগল! কেউ কিচ্ছু জানবে না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

একটু ভেবে আবার প্রশ্ন করলাম, 'তুই ঠিক জানিস কেউ জানবে না?'

'কেউ জানবে না। তাছাড়া জানাজানি হলে তো তোর চাইতে আমার বেশি ক্ষতি।'

'এখন ডাকলি কেন?'

'তোর সঙ্গে কথা বলব বলে, তোকে দেখব বলে...'

'বাজি বকিস না।'

'সত্যি বলছি তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। কিছুতেই আর থাকতে পারলাম না।'

না হেসে পারলাম না। এবার ওকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি তুই ভারি ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

ও হাসতে হাসতেই জবাব দিল, 'তুই কি কম ইন্টারেস্টিং ছেলে?'

সেই শুরু। যৌবনের উদ্বোধন। জীবন-রহস্যের প্রথম আবরণ উন্মোচন। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই গীতিকে পেয়েছি। আস্তে আস্তে বেশ নেশাটা জমেছে।

আজ উর্বশীকে পেয়ে, বৃষ্টির মধ্যে পর্দা ফেলা রিকশার মধ্যে পাশে পেয়ে ওই রকম নেশার ঘোর আছে নাকি? পর্দাকে ফাঁকি দিয়েও আমাদের গায়ে বৃষ্টি লাগছে। বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে! কুঁকড়ে বেশ ঘন হয়ে বসেছি দুজনে। বৃষ্টি বড় ভালো লাগছে। উর্বশীকেও ভালো লাগছে। ডান হাতটা পিছন দিক

দিয়ে ঘুরে ওর ডান দিকে।

ও আমার বাঁ হাতটা কোলের উপর টেনে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'বেশ ভালো লাগছে না বেণু?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক দিন মনে থাকবে এই সন্ধেবেলার কথা।'

'কেন বল তো?'

'অনেককে কাছে পেয়েছি কিন্তু নিজের তাগিদে কারুর কাছে যাইনি। আজ মনে হচ্ছে এই রাত্তিরটা আমার।'

বৃষ্টির মধ্যে রিকশা চলেছে ল্যান্সডাউন ধরে। বুঝতে পারছি না কতদূর এলাম। একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম।

'কি দেখছ?'

'কতদূর এলাম তাই দেখছি।'

'সারা রাত ধরেই রিকশা চলুক না। ক্ষতি কি?'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'শুধু রিকশা চড়ে কি লাভ?'

'বেণু?'

'কি?'

'সত্যিই তাই মনে হচ্ছে?'

'যদি বলি মনে হওয়া কি অন্যায়?'

'অন্যায় তো আমি বলিনি।'

'তবে?'

'তবে আর কি? জানা থাকল।'

আমি নিরুত্তর রইলাম। আর কিছু বলতে পারলাম না। আর এগুতে পারলাম না। ও ভীষণ জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বলল, 'তোমার মতো আমি লেখাপড়া শিখতে পারিনি ঠিকই কিন্তু দেহে তো মহা পণ্ডিতের রক্ত বইছে। তাইতো তোমাদের মতো ছেলেদের ভালো লাগে। ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু আজকাল এত নোংরা লোকের সঙ্গে আমার দিন কাটাতে হয় যে তোমাদের মতো ছেলেদের দেখলে ভয় লাগে, লজ্জা করে।'

আমি ওর মাথায়, মুখে হাত দিয়ে একটু আদর করে বললাম, 'ভয় কি? ভয় করবে কেন?'

ও কিছু না বলে আমার কাঁধের উপর মাথাটা রাখল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবে না?'

'না।'

'কেন?'

'এত সুখে, এত আনন্দে কথা বলা যায় না।'

চুপ করে রইলাম।

'বেণু, মাঝে মাঝে তোমাকে পাব তো?'

'পাবে।'

আমার জীবনের সে এক অবিস্মরণীয় রাত্রি। অচিন্ত্যনীয় অনুভূতি নিয়ে সে রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। বেশি কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করল না। শুধু মাকে বললাম, বৃষ্টিতে ভিজে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। মা বিশ্বাস করলেন। খেলাম না। শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবলাম। ভাবলাম আমি কি আমাদের পরিবারের ইতিহাস নতুন করে সৃষ্টি করছি? বাপ-ঠাকুরদা যে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেননি, আমি কি সেই ইতিহাসই সৃষ্টি করব?

চার

স্মৃতিদির বিয়েটা মোটামুটি ভালো ভাবেই হয়েছিল। জামাই দেখে সবাই খুশি হয়েছিলেন। দেখতে শুনতে বেশ ভালো। আই-এস-সি পাস। আসানসোলের কাছেই একটা কারখানায় চাকরি করেন। দেশ নলহাটির দিকে। ছুটি-ছাটায় দেশে যাতায়াত করেন। মা-বাবা ভাই-বোন সব ওখানেই। জামাই সনৎবাবু আগে মেসে থাকতেন। বিয়ের পর বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন।

স্মৃতিদি খুশি। দারুণ খুশি। জীবনে এই প্রথম একটু মর্যাদা পেল। এই প্রথম বাঁচার স্বাদ পেল। বিয়ের বছর খানেক পরে মাস দুই কলকাতায় ছিল। বাড়ির সবাইকে দুটো সিনেমা দেখাল। মা আর বোনদের নতুন জামাকাপড়ও দিল। তাছাড়া বিকেলের দিকে তেলে ভাজা বা ঘুঘনি তো প্রায় রোজই কিনতো, খাওয়াতো।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি স্মৃতিদি মার সঙ্গে গল্প করছে। হঠাৎ মনে হলো স্মৃতিদিকে দেখতে আরো ভালো হয়েছে। বিয়ের আনন্দে, সুখে শান্তিতে এত পরিবর্তন হয়? নিশ্চয়ই হয়।

'আচ্ছা স্মৃতিদি, বিয়ের পর তোমার মনটা এত ছোট হয়ে গেল কেন বলতো?'

মা সঙ্গে সঙ্গে বকুনি দিলেন, 'কি যা তা বলছিস?'

'আঃ! তুমি চুপ করো তো।' স্মৃতিদির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কি হলো? জবাব দাও।'

'তুই কি করে বুঝলি আমার মন ছোট হয়েছে?'

'মন ছোট না হলে শুধু বোনেদের সিনেমা দেখালে?'

'তুই তো সিনেমা দেখা পছন্দ করিস না।'

'তুমি কি আমাকে যাবার কথা বলেছিলে?'

'বলব কি?' বাংলা সিনেমার কথা বললেই তো তুই বলিস ওইসব ন্যাকামী দেখা যায় না।'

হাসলাম। 'ঠিক আছে। তুমি তো ইংরেজি বই দেখাতে পারতে?'

'আমি টাকা দিচ্ছি। তুই দেখে আয়।'

'আমি একলা একলা কেন দেখব? তুমি না গেলে আমি যাব না।'

'আমি যে ইংরেজি বই বুঝতে পারি না।'

'আমি তোমাকে দেখাব। তুমি আমার গেস্ট। তাছাড়া আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব কিন্তু তোমাকে যেতে হবেই।'

এবার মা স্মৃতিদিকে বললেন, একটা ইংরেজি বই দেখে আয়। কি ক্ষতি আছে?

আমি মজা করে বললাম, চল, চল মার পয়সায় মেট্রো বা লাইটহাউসে একটা সিনেমা দেখে আসি। তাছাড়া মার তো একটা প্রেস্টিজ আছে। নিশ্চয়ই ট্যাক্সি ভাড়া আর রেস্টুরেন্টে খাবার জন্যেও দশ-পনের টাকা না দিয়ে পারবে না।

মা হাসতে হাসতে বললেন, বাঁদর ছেলের কথা শুনলি?

'এখুনি টাকা দেবে? অ্যাডভান্স বুকিং করে আসতাম।'

মা বললেন, 'মোটেও অ্যাডভান্স বুকিং করতে হবে না। যেদিন যাবি সেদিন টাকা দেব।'

'যেদিন মানে? কালই।'

'ঠিক কালই পাবি।'

পরের দিন সকালে মার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম। কলেজ থেকে ফেরার পথে টিকিট কেটে এনেছিলাম। ইভনিং শো। কোণার দিকে দুটো সীট। বাড়িতে এসে একটু খাওয়া-দাওয়া করে আর জামা-প্যান্ট পাল্টে স্মৃতিদিকে নিয়ে লাইটহাউসে গিয়েছিলাম। লাইটহাউসে যাবার জন্য স্মৃতিদিও বেশ সেজেছিল।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, স্মৃতিদি তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে!

স্মৃতিদি হাসতে হাসতে বলল, সত্যি বল না খারাপ লাগছে না তো?

'সত্যি বলছি তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।'

স্মৃতিদি একটু কাছে এগিয়ে এসে খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি কিন্তু কোনোদিন লাইটহাউসে যাইনি। তুই আমাকে একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দিবি।

'ঠিক আছে। কিচ্ছু ঘাবড়িও না।'

পর পর কয়েকটা বাসে ভিড়ের জন্য উঠতে পারলাম না। একলা হলে ঠিকই চড়তাম কিন্তু স্মৃতিদিকে নিয়ে ওই ভিড়ে চড়া যায় না। শেষে যে বাসে উঠলাম, সেটাতেও বেশ ভিড়। তবুও কোনোমতে ভিতরে গেলাম দুজনেই। আমি স্মৃতিদির সামনে দাঁড়ালাম। ওর গায়ে কিছু গহনা ছিল। তাছাড়া স্মৃতিদি ইয়ং মেয়ে! একটু গার্ড করে না থাকলে কিছু লোকের কি খেয়াল হবে, বলা মুস্কিল।

হলে পৌঁছতে কয়েক মিনিট দেরি হলো। আসল বই দেখানো শুরু হয়নি তবে

ট্রেলর দেখান শুরু হয়েছিল। অন্ধকার হলের দরজায় গেট কীপার টিকিটের অর্ধেকটা নিয়ে আমাদের ভিতরে যাবার অনুমতি দিল। স্মৃতিদি আলতো করে আমার হাতটা ধরতে গেল। ওকে ধরতে দিলাম না। আমিই ওর হাতটা ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। তারপর একজন টর্চ নিয়ে আমাদের টিকিটের সীট নম্বর দেখে তর তর করে এগিয়ে টর্চের আলোয় দুটো সীট দেখিয়ে দিল। আস্তে আস্তে আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম। বসলাম।

স্মৃতিদি আমার কাছে সরে এসে একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, এখানকার স্ক্রিনটা উঁচুতে কেন রে?'

'হেলান দিয়ে বসে ভালো করে দেখা যাবে বলে।'

'এইটাই ইন্ডিয়ার বেস্ট হল, তাই না রে?'

'ঠিক জানি না। তবে খুব ভালো হল।'

মাঝখানে হাতল ছিল ঠিকই তবুও আমরা দুজনে বড় কাছাকাছি বসেছিলাম। ওর প্রশ্ন শুনে উত্তর দেবার জন্য আমাদের দুটো মাথা প্রায় এক হয়ে গিয়েছিল। হাত দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সীন বুঝাবার জন্য এত বেশি নাড়াচাড়া করতে হচ্ছিল যে কয়েকবার বুকে পর্যন্ত হাত লেগে গেল। স্মৃতিদি কিছু বলল না। আমার বেশ ভালো লাগল। আরো বেশি উৎসাহের সঙ্গে হাত নেড়ে ওকে বুঝাতে লাগলাম, স্মৃতিদি তবু কিছু বলল না। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম ওর কি ভালো লাগছে? নাকি খেয়াল করছে না? না, না, তাই কি হয়! ইয়ং মেয়ে।

বুকে হাত লাগলে বুঝতে পারবে না, তাই কি কখনও হয়? অথবা অনেকদিন স্বামীকে কাছে না পাবার জন্য এমন একটু আধটু মৃদু স্পর্শ ভালোই লাগছে।

'হ্যাঁ রে তোর এইসব বই দেখতে লজ্জা করে না?'

'লজ্জা করবে কেন?'

আমি হাসলাম। 'এ তো কিছুই না। ওসব দেশে আরো কত মারাত্মক বই হয়।'

'তুই দেখেছিস?'

'দুটো-একটা দেখেছি। তাছাড়া ম্যাগাজিনে ছবি দেখেছি।'

ইন্টারভালে পপকর্ন আর ক্যাডবেরি কিনে আনলাম। স্মৃতিদি বলল, 'চিনেবাদাম পেলি না?'

'তুমি চিনেবাদাম খাবে?'

'হ্যাঁ, নিয়ে আয়।'

চিনেবাদাম কিনে হলে ঢুকতে গিয়েই দেখলাম বই শুরু হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। চিনেবাদাম খেতে খেতে ছবি দেখছিলাম।

বোঝাচ্ছিলাম। চিনেবাদাম শেষ হবার পর পপকর্ন। প্যাকেটটা আমার বাঁ হাতে। মাঝে মাঝে ডান হাতে কয়েকটা পপকর্ন নিয়ে ওকে দিচ্ছিলাম। প্রায় প্রত্যেকবারই ওর বুকে হাত লাগছিল। দু'একবার বেশ জোরে লাগল। কি আশ্চর্য! স্মৃতিদি তবুও কিছু বলল না।

মাঝে মাঝেই গীতিকে পেয়ে পেয়ে আমার রক্তে বেশ নেশা লেগেছিল। নেশাটা চাপা থাকত! থাকে। কিন্তু এই সিনেমা হলের অন্ধকারে স্মৃতিদিকে কাছে পেয়ে, এতক্ষণ কোনো প্রতিবাদ না আসায় আমার নেশাটা আরো বেশি বাড়ল। পপকর্নের প্যাকেটটা ডান হাতে নিয়ে ওর সামনে, বুকের কাছে ধরে রইলাম।

'এ কিরে! চান করার সীনও দেখাচ্ছে?'

'কেন দেখাবে না?'

'ওদের দেশে বুঝি এই রকম লম্বা লম্বা চৌবাচ্চা হয়?'

'ওগুলো চৌবাচ্চা না। ওকে বাথ টাব বলে।'

'কোনো জামা-কাপড় না পরেই ওর মধ্যে চান করছে?'

'হ্যাঁ।'

আমার হাতটা ওর বুকের সঙ্গে লেগে আছে। বেশ একটু চেপে। দুজনেই পপকর্ন খাচ্ছি। সিনেমা দেখছি। ওকে বোঝাচ্ছি। একবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'বাংলা বইয়ের চাইতে ভালো?'

স্মৃতিদি একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'বাংলা বই কখনও এত ভালো হতে পারে?'

সিনেমা দেখে বেরুবার পর স্মৃতিদি বলল, 'চল ট্যাক্সিতে যাই।'

'কি দরকার? অযথা তিন-চার টাকা খরচ হবে।'

'হোক। আমি টাকা দেব।'

হলের বাইরে আসতেই বলল, 'ট্যাক্সি ধর।'

'সত্যি ট্যাক্সিতে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চল একটু হাঁটি। একটু এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।'

ফিরপোর তলায় আসতেই একটু দাঁড়ালাম। হকারের সামনে। নানা-ধরনের

ম্যাগাজিন দেখছিলাম।

'এইসব দোকানেই বুঝি ওইসব সিনেমার খবর-টবর, ছবি-টবিওয়ালা ম্যাগাজিন পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ।'

'একটা কিনে নে তো।'

'আমার কাছে আছে।'

'তোর কাছে একটাই আছে?'

'কেন?'

'আমার একটা চাই।'

'যদি মাসিমা বা গীতি দেখতে পায়?'

'কেউ দেখবে না।'

'ঠিক আছে।' নিয়ে যেও।'

সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

'আচ্ছা স্মৃতিদি সনৎদা তোমাকে বুঝি অনেক টাকাকড়ি দেন?'

'কলকাতায় আসছি বলে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে।'

'উনি লোকটা বেশ ভালো তাই না?'

'ভালো ঠিকই তবে আমি ওকে পাই কোথায়?'

'কেন?'

'ওর এক বন্ধুর স্ত্রীর শরীর খারাপ বলে আজ দু'মাস ধরে নাইট ডিউটি দিচ্ছে।'

'দিনের বেলায় তো বাড়ি থাকেন?'

'রাত্রি নটা-সাড়ে নটা পর্যন্ত তো ইউনিয়ন অফিসেই থাকে। বাড়ি ফিরে কোনোমতে দুটো খেয়েই ফ্যাক্টরি দৌড়বে।'

'সনৎদা বুঝি ইউনিয়নের পাণ্ডা?'

'পাণ্ডা মানে? ও তো সেক্রেটারি।' একটু থেমে স্মৃতিদি স্বগতোক্তি করল, সারাদিন কেবল মিটিংই করছে।

'খুব মিটিং করেন বুঝি?'

'শুধু কি মিটিং? থানা কোর্ট-কাছারী আর উকিলের কাছে দৌড়োদৌড়ি তো লেগেই আছে। তাছাড়া দু'তিন দিন পর পরই বর্ধমানে যেতে হয়।'

'তোমরা সিনেমা-টিনেমা যাও না?'

'ও সিনেমায় যাবে? তাহলেই হয়েছিল।'

স্মৃতিদিকে দেখে বোঝা যায় না ওর মধ্যে এত চাপা হতাশা আছে। সিনেমা

হলে আমাকে কোনো বাধা না দেওয়াতেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল কিছু একটা ব্যাপার আছে। এখন বুঝলাম, স্মৃতিদির অতৃপ্তি কোথায়।

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে কয়েকটা ভালো সিনেমা দেখাব।'

'বাংলা না ইংরেজি?'

'তুমি কি দেখতে চাও?'

'তুই যা দেখাবি।'

'তুমি মাকে বলো ওখানে সিনেমা-টিনেমা দেখা হয় না বলে এখানে আমাকে নিয়ে কয়েকটা বই দেখবে।'

'সেজন্য তোর চিন্তা নেই।'

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে ট্যাক্সি ধরলাম। উঠলাম। বসলাম। খুব কাছাকাছি নয়। একটু দূরে বসলেও আমি হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলাম।

'তোমার মতো বৌকে বাড়িতে রেখে সনৎদা যে কিভাবে বাইরে বাইরে কাটান তাই ভাবি।'

'কেন আমি কি?'

'তুমি জান না?'

'কি জানব?'

'তুমি দেখতে ভালো, তা তুমি জান না?'

'বাজে বকিস না।'

'সত্যি বলছি। বিয়ের পর তোমাকে দেখতে আরো ভালো হয়েছে।'

'ভালো বলেই তো স্বামীকে কাছে পাই না।'

'এখন পাও না। দু'দিন পরে পাবে।'

'ঘোড়ার ডিম পাব।'

'ঠিক পাবে। অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?'

ট্রাম ডিপোর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। আমি ভাড়া দিলাম। স্মৃতিদি বলল, 'তুই দিলি কেন?'

'তাতে কি হল?'

'আমার কাছে টাকা আছে। তাছাড়া দু একদিনের মধ্যেই আবার আমাকে টাকা পাঠাবে।'

'এর পরের দিন দিও।'

রিকশায় উঠলাম।

স্মৃতিদি বলল, আজ তোকে যা যা বললাম, কাউকে বলিস না কিন্তু।

'তুমি কি পাগল হয়েছ?'

'বিয়ের পর কিছুদিন খুব ভালো কাটলেও, আজকাল আর ভালো লাগে না। অথচ কাউকে বলতে পারি না।'

'যদিও এসব সাময়িক ব্যাপার তবুও বাড়িতে কাউকে কিছু বলো না। সবার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাবে।'

'কাউকে এ পর্যন্ত বলিনি। তোকেই আজ প্রথম বললাম।'

'ওসব নিয়ে বেশি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যে কদিন এখানে আছ ঘুরে ফিরে আনন্দ করো।'

'আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলে তোর পড়াশুনার ক্ষতি হবে না তো?'

'না, তা হবে না। তবে মার কাছ থেকে পারমিশন নেবার দায়িত্ব তোমার।'

'ওর জন্য তোর চিন্তার কিছু নেই।'

রাত্রে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম স্মৃতিদির কথা। সুন্দর সংযত মিষ্টি একটা মেয়ে। সবকিছু পেয়েও একটু ফাঁক থেকে গেছে। ছোট্ট একটা ক্ষত মনের মধ্যে, গভীরে গোপনে বাসা বেঁধেছে। কেউ জানতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কিন্তু আমি বুঝলাম। সন্ধান পেলাম ওর অতৃপ্ত মনের, দেহের।

সারা পাড়ায় আমাদের পরিবারের সুনাম আছে। বাবা তো অজাতশত্রু। মাকে যারা চেনেন, জানেন, তারা মাকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। আমারও সুনাম আছে। পাড়ার কোনো ঝামেলায় আমি নেই। রাজনীতি থেকে সরস্বতী পুজো এর কোনো কিছুতেই না। অথচ ওদের অনেকেই আমার বন্ধু। স্কুলের বন্ধু। পাড়ার বন্ধু। ছেলেবেলার বন্ধু। কেউ কোনোদিন আমাকে মানিকের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে বা রাস্তাঘাটে ইয়ার্কি-বাঁদরামি করতে দেখেনি। সব চাইতে বড় কথা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছিলাম। অঙ্কে লেটার পেয়েছিলাম।

অথচ?

অথচ আমি কত খারাপ। খারাপ হয়েছি। হচ্ছি। হয়তো আরো খারাপ হবো। বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারে না, ভাবতে পারে না আমার মধ্যে, আমার মনের মধ্যে, রক্তের মধ্যে কতকগুলো বিষাক্ত পোকামাকড় কিলবিল করছে। কথায়-বার্তায় আমি বিনম্র কিন্তু চোখে আমার লোভ। দারুণ লোভ। স্মৃতিদির প্রতিও আমার লোভ। মাকড়সা যেমন সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে জাল বিস্তার করে শিকার ধরার ফাঁদ পাতে, আমিও ঠিক তেমনি করে স্মৃতিদিকে ধরবার ব্যবস্থা করছি। করব। নিশ্চয়ই করব।

কিন্তু?

কিন্তু আমি তো এসব চাইনি। কোনোদিন চাইনি। কোনোদিন ভাবিনি। স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেবেলা থেকে ওদের সঙ্গে খেলা করছি। সহজ, সরলভাবে খেলা করেছি। মিশেছি। একই বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতো মিশেছি। চোখের সামনে ওদের বড় হতে দেখেছি। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে দেখেছি। দেখেছি দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে। দেখেছি খেলা করতে, ঘুমুতে। দেখেছি হাসতে, খেলতে। দেখেছি সুখের দিনে, দুঃখের অন্ধকারে। দেখেছি নানাভাবে। ওরা ছাড়া আমার তো কোনো বন্ধু নেই। লেখাপড়ার সময়টুকু ছাড়া সব সময়ই ওদের নিয়ে কাটাই।

গীতি কেন আমার মধ্যে এই রক্তের নেশা ঢুকিয়ে দিল? জানি সংসারের অসংখ্য কাজে ওকে বাইরের নানা জায়গায় নানাজনের কাছে যেতে হয়। সাহায্য, সহযোগিতা চাইতে হয়। শিশিরদা বা বলাইদা যে বিশেষ সুবিধের লোক নয়, তা আমি জানি। বেশ অনুমান করতে পারি ওরা গীতির সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করে। ওকে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় শিশিরদার স্নেহ, বলাইদার আদরও পেয়েছে। পায়। ওরা ওর দেহে-মনে যে আগুন জ্বালিয়েছে, সেই আগুনের জ্বালা, দাহ থেকে বাঁচার জন্যই কি ও আমার কাছে এসেছিল? আসে?

এ আগুনে যে অনেক, অনেক কিছু জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে পারে, হয়, তা কি গীতি জানে না? বোঝে না? আমার মধ্যে যে আগুন ও জ্বালিয়েছে, সেই আগুনেই হয়তো ওর দিদি জ্বলবে, পুড়বে। আমার কিছু করার নেই। এই স্রোতের উল্টো দিকে যাওয়া খুব মুস্কিল। অসম্ভব। আমার পক্ষে অসম্ভব। বর্তমানে অসম্ভব।

টেনুর মাস্টার মশাই বিকেলের দিকে আসেন। সন্ধের পর মা তাই টেনুকে নিয়ে একটু ঘুরতে ফিরতে যান। এটা মার বরাবরের অভ্যাস। বাপের বাড়ির অভ্যাস এখনও রেখেছেন। কোনোদিন মাসিমার কাছে, কোনো দিন আবার অন্য কারুর বাড়ি। সপ্তাহে একদিন মাসিদের কাছে যাবেনই। কালীঘাটে মেজ মাসি আর ঢাকুরিয়ায় বড় মাসির বাড়ি। দুজনেরই সংসারে বড় বেশি ঝামেলা। তাই মা যান।

মাঝে মাঝে মাসিমা ঠাট্টা করে বলেন, হাজার হোক বড়লোকের আদুরে মেয়ে। মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কয়লা ভাঙতে ভাঙতে হাতে কড়া পড়ে গেল আর তুমি বলছ আদুরে মেয়ে। মাসিমা তবু ছাড়েন না, সে যাই বল দিদি, ভাসুর তোমাকে খুব যত্নে রাখেন। মা হাসতে হাসতে বলেন, একটু জোরে বল যাতে উনি ডিসপেন্সারিতে বসেও শুনতে পান।

সে যাই হোক। দু একদিন পরে মা টেনুকে নিয়ে বড় মাসির ওখানে গেলে আমি দরজা বন্ধ করে আমার ঘরে এলাম। পড়তে বসলাম। একটু পরেই পিছনের দরজায় আওয়াজ। বুঝলাম ও বাড়ি থেকে কেউ এসেছে। উঠে গেলাম। দরজা খুলে দেখি স্মৃতিদি। ওকে দেখেই আমি হেসে ফেললাম।

'কি হলো? হাসছিস কেন?'

'কিছু না। এমনি।'

'এমনি এমনি কেউ হাসে? বল না হাসছিস কেন?'

'তুমি এলে বলে।'

'তাতে হাসবার কি হলো?'

'মা আর টেনু একটু আগেই বড় মাসির ওখানে গেল, তাই হাসছি।'

স্মৃতিদি হাসল। 'বড্ড ফাজিল হচ্ছিস। এক চড় খাবি।'

'তোমাকে কি চড় মারতে বারণ করেছি?'

'তুই কি ঘরে যেতে দিবি না?'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

দরজা বন্ধ করে ঘরে গেলাম। আমার ঘরে।

'জ্যাঠামণি কোথায়?'

'জান না জ্যাঠামণি এখন কোথায় থাকেন?' হাসতে হাসতে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'ডিসপেন্সারিতে?'

'হ্যাঁ।'

আমি খাটের উপর বসে টেবিলে হাত রেখেছি। স্মৃতিদি একটু এদিক ওদিক দেখে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে, সেই ম্যাগাজিনগুলো কোথায়?'

ন্যাকামি করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন ম্যাগাজিনগুলো?'

'ওই যে বিলেতি সিনেমার।'

'ওগুলো সত্যি দেখবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওগুলোতে ভারি খারাপ ছবি আছে।'

'তা হোক। তুই দেখা।'

'তোমার দেখা কি ঠিক হবে?'

'তুই দেখতে পারিস আর আমি দেখতে পারি না?'

ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি লুকিয়ে বললাম, আমি ইয়ংম্যান। ব্যাচেলার।

আমি সবকিছু দেখতে পারি কিন্তু তুমি তো ম্যারেড মেয়ে।

স্মৃতিদি সত্যি সত্যিই আমার কান ধরে বলল, 'তাড়াতাড়ি বের কর।'

কি করব! বের করলাম। এক বাণ্ডিল। 'নাও দেখ। পেট পুরে দেখ কিন্তু পেট খারাপ হলে আমি জানি না।'

স্মৃতিদি একটা কপি হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই আপন মনে বললো, বাপরে বাপ!

'কি হলো?' আমি একটু দূরে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম।

'এইসব সিনেমায় দেখায়?'

'হ্যাঁ।'

'এগুলো বিলেতি ছবি?'

'কই দেখি।'

ও ম্যাগাজিনটা নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, 'এইগুলোর কথা বলছিলাম।'

দেখলাম। সুইডিস ছবির বেড-রুমের দৃশ্য। জন্মদিনের পোশাকে স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে। ছবি নেবার কায়দা ও আলোছায়ার জন্য কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'বিলেতের না, সুইডেনের ছবি।'

স্মৃতিদি মুখে কিছু না বলে পরপর ম্যাগাজিন দেখল। আমি ওর পাশে গা ঘেঁসে বসে আছি। ওকে দেখছি। কখনও ওর একটা হাত আমার হাতের মধ্যে নিচ্ছি কখনও ওর চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে খেলা করছি। ওর গলায়, পিঠে হাত দিচ্ছি। আস্তে আস্তে একটা হাত দিয়ে ওকে ঘিরে ধরলাম। স্মৃতিদি কিচ্ছু বলল না।

'তুই এই রকম ছবি দেখেছিস?' আমার দিকে না তাকিয়েই স্মৃতিদি প্রশ্ন করল।

'কয়েকটা দেখেছি।'

'আমাকে দেখাতে পারিস?'

'এখন তো হচ্ছে না। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখেছিলাম!'

'এসব সিনেমা দেখতে কেমন লাগে রে?'

হাসলাম। 'আমার তো খুব ভালো লাগে তবে এখন তোমার না দেখাই ভালো।'

'কেন?'

'এসব ছবি স্বামীকে নিয়ে দেখাই ভালো।'

হঠাৎ স্মৃতিদি ক্ষেপে গেল। আমার গলা ধরে মাথাটা ওর কোলের উপর নিয়ে চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আর বাজে কথা বলবি?'

আমি হাসতে হাসতে ওর কোলের ওপর মাথাটা রাখলাম। মুখে কিছু না বলে

দুহাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমি আর তোমাকে ছাড়ছি না।'

আমার হাত ছাড়াবার জন্য ও টানাটানি শুরু করল। পারবে কেন? ও যত টানে আমি তত বেশি জোরে ওকে ধরে থাকি। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ছেলেবেলায় যেমন হতো, ঠিক তেমন। কিন্তু তখন তো আমরা চারা। এখন তো পল্লবিত, মুকুলিত। তখন মনে পাপ ছিল না। এখন সারা মনে পাপ। তখন শুধু পেটে ক্ষিদে ছিল, এখন সর্বাঙ্গে ক্ষিদে। তখন মানুষ ছিলাম, এখন শয়তান হয়েছি। আমার মধ্যে যে শয়তান আছে সে স্মৃতিদিকে রেহাই দিল না। ওর মধ্যে যে শয়তান, সেও বাধা দিল না। শয়তানের সঙ্গে শয়তানের দোস্তি হল।

ওকে বিদায় দেবার সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাগ করলে না তো?'

'জানি না।' মুখ নীচু করে জবাব দিল।

বুঝলাম রাগ করেনি। তবুও আরেকবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'বল না রাগ করেছ কিনা?'

ও এবার আমার মুখের দিকে চাইল। 'তুই আমাকে খারাপ ভাবলি না তো?'

'না, না, খারাপ ভাবব কেন? তোমার চাইতে আমি বেশি খারাপ।'

'তোর কোনো দোষ নেই।'

'তুমিও কোনো দোষ করনি।'

স্মৃতিদি দুটো আঙুল দিয়ে আমার নীচের ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে বলল, 'আজ চলি। অনেকক্ষণ এসেছি।'

'যাও।'

ও চলে গেল। তবুও আমি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাল। হাত নাড়ল। আমিও হাত নাড়লাম। ও অদৃশ্য হয়ে গেল। তবুও আমি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। নড়তে পারলাম না। তারপর দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম ম্যাগাজিনগুলোর কথা। ওগুলো বেশ দামী। আমার পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। শিশিরদা গীতিকে দিয়েছিলেন। গীতি আমার কাছে রেখেছে। আমার কাছে এসে ও দেখে। দেখেছিল। আমাকে গ্রাস করেছিল। আজ ওরই দিদি এল ওই ম্যাগাজিনগুলো দেখতে আর আমি তাকে গ্রাস করলাম।

কিন্তু উপায় কি?

জানি না। জানতে চাই না। এখন জানার মতো মন আমার নেই।

কদিন পরে স্মৃতিদি বলেছিল, জানিস বেণু, জীবনে না পাবার দুঃখ সহ্য করা

যায় কিন্তু পেয়ে হারাবার দুঃখ অসহ্য লাগে। ছেলেবেলা থেকেই তো কষ্ট করছি। ভেবেছিলাম বিয়ের পর সুখী হবো কিন্তু তা আর হলো না।

ওকে সান্ত্বনা জানিয়ে বললাম, তুমি এত হতাশ হচ্ছো কেন?

'তুই বুঝবি না বেণু। তুই যদি মেয়ে হতিস, তাহলে বুঝতে পারতিস আমার মনের অবস্থা।'

'আমি মেয়ে না বলে কি তোমার দুঃখ বুঝব না?'

'শুধু জেনে রাখ আমার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে কিন্তু একটুও ভালোবাসে না।'

আমি ওর অভিযোগের গুরুত্ব কমাবার জন্য হেসে বললাম, 'উনি যদি তোমাকে ভালো না বাসতেন তাহলে দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করতেন না।'

স্মৃতিদি মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ডান হাতটা আমার বুকে ছুঁইয়ে বলল, 'তোর বুকে হাত দিয়ে বলছি, বিশ্বাস কর, ও আমাকে ভালোবাসে না।'

'তুমি বুঝলে কী করে?'

ও মুখ নীচু করে অনেকক্ষণ দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াল। বুঝলাম মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ওকে বিব্রত করছে। ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, 'আমার প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হয়নি। তাই না?'

ও আমার হাঁটুর ওপর হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ও আমাকে কোনোদিন একটু আদর করে না, ভালোবাসে না। আসানসোলের বাসায় আসার পর একদিনের জন্যও আমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়নি।'

বুঝলাম নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

স্মৃতিদি একটু থেমে আমার শুরু করল, 'অথচ আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করে না। আমাকে কিছু চাইতে হয় না। প্রয়োজনের আগেই সব কিছু পেয়ে যাই।'

'তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর না?'

'প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করতাম কোনো অন্যায় করেছি কিনা, কোনো ভুল করেছি কিনা। ও হেসেই উড়িয়ে দিত। আজকাল আর কিছু বলি না। ও ওর মতো থাকে, আমি আমার মতো থাকি।'

'আসানসোলের আর কেউ তোমার এসব কথা জানে? কাউকে কিছু বলেছ?'

'না, না, ওখানকার কেউ কিছু জানে না। কাউকে কিছু বলি না। এসব ব্যাপারে বাইরের কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

'তবে আমাকে বললে যে?'

স্মৃতিদি হাসতে হাসতে আমাকে একটা চড় মেরে বলল, 'তুই কি পর?'

সংসারের সুড়ঙ্গপথে আমি এখনও প্রবেশ করিনি। সংসারের দ্বন্দ্ব, সংঘাতের সঙ্গে এখনও মুখোমুখি না হলেও আস্তে আস্তে বেশ অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। স্মৃতিদিকে বরাবরই আমার ভালো লাগে। নারী যে কল্যাণী হয়, তা ওকে দেখলে বোঝা যায়! সুষ্ঠুভাবে অনুভব করা যায়। ওর জিভটা বোধহয় আমাদের সবার চাইতেও বড় বেশি নরম! তাইতো একটু শক্ত কথা পর্যন্ত ও বলতে পারে না! ও আঘাত পেতে জানে, আঘাত দিতে জানে না! ও গ্রহণ করতে দ্বিধা করে কিন্তু বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না। ছেলেবেলায় যখন আমরা খেলা করতাম তখন প্রায় সব সময় গীতি বৌ হতে চাইত আর স্মৃতিদি কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ পরে মা হতো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওর দেহে বোধহয় হাড় নেই। বোধহয় সারা বুক জুড়ে আছে হৃৎপিণ্ড!

ওর কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হলো। রাস্তা-ঘাটে বাড়িতে-কলেজে সব সময়ই ওর কাতর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠত। পড়াশোনাতেও ঠিক মন বসাতে পারলাম না।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি আমাদের ভিতরের বারান্দায় বিরাট মিটিং হচ্ছে। মা, মাসিমা, স্মৃতিদি, গীতি, বীথি, টেনু। এমন কি ওদের ভাই মন্টু পর্যন্ত। আমি ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিদি বলল, এইতো বেণু এসেছে। আপনি আমার সামনে বলে দিন। তা নয়তো ও রাজি হবে না।

আমি চেয়ারে বসে জুতো খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

মা বললেন, 'তুই স্মৃতিকে একটু ভালো করে কলকাতা চিনিয়ে দিবি?'

'তার মানে?'

'ও তো কোনোদিন ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখেনি, তাই তুই একটু দেখিয়ে দিবি।'

'কেন?'

'কেন আবার?' ভালো করে না চিনলে বন্ধু-টন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হয় না?'

'কলকাতা চেনার সঙ্গে বন্ধুদের কি সম্পর্ক?'

এবার স্মৃতিদি। 'দেখেছেন মাসিমা? কেমন অ্যাভয়েড করছে?'

মা এবার আমাকে একটু বকুনি দিলেন। 'ও কদিনের জন্য এসেছে আর তুই এমন করে কথা বলছিস? যত বড় হচ্ছিস তত বেশি গুণ বাড়ছে, তাই নারে?'

'কেন ওরা দুই বোনে ঘুরতে পারে না?'

গীতি বলল, 'না বাপু, আমার দ্বারা ওসব হবে না।'

মা বললেন, 'আর বাজে কথা বললে তুই এবার থাপ্পড় খাবি।'

মাসিমা এতক্ষণ বসে বসে হাসছিলেন। এবার বললেন, 'দিদি, তুমি রাগছ কেন? ও এমনি তর্ক করছে।'

আমি এবার জানতে চাইলাম, 'সনৎদার পয়সায় ট্যাক্সি করে ঘুরব, না তোমার পয়সায় বাসে ঘুরব?'

মা এবার সত্যি সত্যি হাত তুললেন, 'সে চিন্তা তোর কেন রে? তুই তো আর রোজগার করিস না।'

সবাই হো হো করে হেসে হেসে উঠল। আমিও হাসতে হাসতে আমার ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেলাম।

দুঃখ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা সবার সমান হয় না। কেউ বেশি দিন লড়াই করতে পারে, কেউ পারে না। কেউ মুখ বুজে সহ্য করে, কেউ সোচ্চার হয়ে ওঠে। কেউ ধর্ম নিয়ে মাতামাতি শুরু করে, কেউ দুঃখ ভুলে থাকার জন্য আনন্দের পথ বেছে নেয়। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে।

মাটির তলায় আগ্নেয়গিরি যেমন চিরকাল অন্তরের আগুন লুকিয়ে রাখতে পারে না, মানুষ তার হতাশা, ব্যর্থতা সব সময় চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। কবে কোন্ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে, ছিদ্র দিয়ে যে ভেতরের আগুন, লাভা, মনের অসন্তোষ বেরিয়ে আসবে, কেউ জানে না। জানতে পারে না। লাইটহাউসে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখতে গিয়ে যে মনে রঙ লাগবে, সাময়িক আনন্দ-যজ্ঞের আমন্ত্রণ পাবে, তা স্মৃতিদি নিজেও জানতো না।

মানুষ স্বর্গ-মর্ত-পাতালের খবর রাখে। খবর রাখে তার দেহের অণু পরমাণুর। খবর পায় না শুধু নিজের ভবিষ্যতের। জ্ঞানীরাও জানে না, মূর্খরাও জানে না। কেউ জানে না। স্মৃতিদিও না।

ট্রামে-বাসে, পায়ে হেঁটে, রিকশায়-ট্যাক্সিতে করে কলকাতা দেখতে দেখতে আমরা দুজনে ভেসে গেলাম অনেক দূর।

'জানিস বেণু, জীবনে কোনোদিন এত আনন্দ পাইনি।'

'আমিও।'

'তোর মনে থাকবে এইসব কথা?'

'কেন তুমি কি ভুলে যাবে?'

'এইসব কখনও ভোলা যায়?'

'আমিও কোনোদিন ভুলতে পারব না।'

'আচ্ছা তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'একটা কেন, হাজারটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পার।'

'তুই কোনো মেয়েকে ভালোবাসিস?'

'না।'

'সত্যি?'

'সত্যি বলছি।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল।'

'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

স্মৃতিদি একটু থামল। 'আমাকে তোর কেমন লাগে রে?'

আমি হেসে ফেললাম!

'হাসছিস কেন?'

'এতদিন পর এই প্রশ্ন করলে?'

'তাতে কী হলো?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার যাই মনে হোক না, তোকে যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।'

'সত্যি বলছি তোমার মতো মেয়ে হয় না।'

'কেন রে?'

'এক কথায় তুমি বড় মিষ্টি মেয়ে। তোমাকে আমার বরাবরই ভালো লাগে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তুই তো কোনোদিন কিছু বলিস নি?'

'বলতে সাহস হয়নি।'

আবার একটু চুপচাপ।

'আচ্ছা স্মৃতিদি তোমার মনে আছে ভয় পেয়ে তুমি একদিন রাত্রে আমাদের ওই নালার ধারে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে?'

স্মৃতিদি হাসল। 'হ্যাঁ, খুব মনে আছে।' একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'এতদিন পর হঠাৎ সে কথা মনে পড়ল?'

'মাঝে মাঝেই মনে হয়।'

'কেন?'

'খুব ভালো লেগেছিল বলে।'

ওই লাইটহাউসে আবার দুজনে গেছি।

'এক্ষুনি ঢুকবি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ছবি শুরু হয়েছে?'

'না।'

'ফাইন্যাল বেল পড়ুক। তারপর ঢুকব।'

'কেন?'

'হল অন্ধকার হলেই ঢুকতে ভালো লাগে।'

আমি ওর কথায় হাসলাম। কত ছোট্ট স্বপ্ন! কত সামান্য আশা। অথচ কত মিষ্টি!

অন্ধকার হবার পরই ঢুকলাম। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। কোণার সীটে পাশাপাশি বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'অন্ধকারে হলে ঢুকতে ভালো লাগে, না?'

'হ্যাঁ।'

ওর হাতের মধ্যে আমার হাত। ওর কোলে।

'মাসিমা আবার কবে তোর মাসির বাড়ি যাবেন জানিস?'

'না।'

'জানলে আমাকে জানাস।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'কি দরকার?'

ও আমার হাতে চিমটি কেটে বলল, 'বলব না।'

'বল না কি দরকার? ওই ম্যাগাজিনগুলো দেখতে আসবে?'

'আসি তো আসব।'

'তারপর যদি কিছু হয়?'

'কি আবার হবে? কিছুই হবে না?'

হবে না বললেই কি হয় না? মা মাসির বাড়ি গেলে স্মৃতিদি আবার এসেছিল। দুজনে পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে, বুকের তলায় বালিশ দিয়ে গীতির ম্যাগাজিনগুলো দেখেছিলাম। দেখতে দেখতে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম। কাছে টেনেছিলাম। খুব কাছে। বুকের মধ্যে। ও তবুও যেন ছবি দেখছিল।

'এবার একটু আমাকে দেখ।'

'চোখ দিয়ে না দেখলেও বেশ দেখতে পারছি।'

'সত্যি?'

'সত্যি। মেয়েরা শুধু চোখ দিয়েই দেখে না।'

মেয়েরা শুধু চোখ দিয়েই দেখে না। ঠিক। ওরা মন দিয়ে দেখে, অন্তর দিয়ে দেখে। দেখে স্পর্শে, গন্ধে, সান্নিধ্যে। আমি আস্তে আস্তে ওকে নিয়ে খেলা করতে শুরু করেছি, তবুও ও চোখ তুলে দেখেনি। দেখার দরকার অনুভব করেনি। চোখ বুজে যা দেখা যায়, চোখ খুলে কি তা দেখা যায়? যায় না। ও যত বেশি স্থির হয়ে থেকেছে, আমি তত বেশি চঞ্চল হয়েছি। পাগল হয়েছি। আমার পাগলামি শেষ হয়েছে, চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়েছে, তখনও ও প্রশান্ত শান্তিতে চোখ বুজে থেকেছে।

পরম আনন্দই যে পরম শান্তি, তা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম।

যাবার আগে আগে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তোকে ছেড়ে আমি কিভাবে থাকব বল তো?'

তবুও ছাড়তে হয়েছিল। স্মৃতিদি আসানসোল ফিরে গেল। সনৎদার সঙ্গেই ফিরে গেল।

পরে মা বেড়াতে গেলে, মাসিদের বাড়ি গেলে গীতি আসত। আগে যেমন আসত! ও যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আসত। আমাকে গ্রাস করতে আসত। যখন যতটুকুই সম্ভব ততটুকুই নিত। জোর করে নিত। আমার কাছ থেকে কেড়ে নিত।

আমার এই ঘরেই এই ম্যাগাজিনগুলো দেখতে দেখতেই স্মৃতিদিকে পেয়েছি। দেখছি, কত পার্থক্য একজন গঙ্গা, একজন ব্রহ্মপুত্র। একজন ধ্বংস। না, না। একজন আনন্দ, একজন উল্লাস! একজন রুদ্র বৈশাখ, একজন বসন্ত। একজন মধ্যাহ্ন, একজন গোধূলি।

গীতিকে এসব কিছু বলি না। বলতে পারি না। বলতে চাই না। আমার কি প্রয়োজন? আমার কি দরকার? আমার কি গরজ? ওরা দুজনেই আমার কাছে আসে, এসেছে। আমি মধু খাই। আনন্দ পাই। নেব না কেন? আমি কি সাধু? সন্ন্যাসী? সাধক? আমি তো এই সংসারেরই একজন। আমিও তো শিশিরদা, বলাইদা। শুধু বাইরের চেহারাটা আলাদা। আলাদা হয়তো রীতি-নীতি। উদ্দেশ্য এক। লক্ষ্য এক। তবুও ভাবি স্মৃতিদির কথা। স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাবার আগে স্মৃতিদি হাতে নির্মাল্য গুঁজে দিয়েছে। বলেছে, নির্মাল্য মাথায় ছুঁইয়ে লেখা শুরু করবি। গীতিও আমাকে ভালোবাসে, আমার ভালো চায়। মা অনেক কিছু জানেন কিন্তু একেবারেই সেলাই করতে পারেন না। আমার প্যান্টের পকেটগুলো বড় বেশি ছিঁড়ে যায়। গীতি নিয়মিত সেগুলি ঠিক করে। সেলাই করে। দরকার হলে

পুরো পকেটটাই পাল্টে দেয়। নিজের ইচ্ছায়, নিজের তাগিদে। আজ নয়, বরাবরই করে। বহুদিন ধরে করে। অনেক সময় মা বারণ করেন, তবুও ও করে। বলে, হঠাৎ কোনোদিন কাজে লেগে যাবে। কাজে লাগে বৈকি। এসব কিছুর পিছনেই একটা কল্যাণ চিন্তা কাজ করছে। কিন্তু তবুও দুজনের মধ্যে কত পার্থক্য! ওরা কত আলাদা।

'আচ্ছা গীতি, তোমার সঙ্গে বুঝি শিশিরদার খুব ভাব?'

'এতদিন পর আজকে একথা জিজ্ঞাসা করছিস?'

'অনেক দিন ধরেই ভাবছি।'

'শুনবি? সব কথা শুনবি?'

'তুমি বললে শুনব।'

'তুই তো জানিস আমি দিদির মতো ভালো না। আমি সব কিছু বলতে পারি।'

ও একটু কি ভাবল আপন মনে। তারপর আমার দিকে চাইল। 'জানিস বেণু, শিশিরদার সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না হয় কিন্তু না গিয়ে পারি না। যেতেই হয়। অনেক দিন ধরেই ভাবছি তোকে সব কথা বলব কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। তোকে সব কথা বললে বোধহয় আমি নিজেও একটু হালকা হবো।'

বেশ গম্ভীর হয়ে বলল গীতি। ও কখনও এমনভাবে কথা বলে না। বুঝলাম ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস!

'আমি যা বলব তা কাউকে কোনোদিন বলবি না তো?'

'না।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল।'

'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

'যদি কেউ জানে তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'না, না, কেউ জানবে না।'

পাঁচ

পুরো নাম শ্রীশিশিরকুমার সরকার। দেশ বোধহয় বর্ধমানে। কাটোয়ার কাছে। বিবাহিত। পুত্র-কন্যাও আছে। সংখ্যা অজ্ঞাত। বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। তবে দেখে কম মনে হয়। মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি। চেহারাটি মোটামুটি ভালোই। পরিপাটি সেজে-গুজে থাকেন। পোশাক দেশী ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাজাবি। মুর এভিনুর একটু আগে নেতাজি রোডের একটা বাড়িতে দুখানি ঘরের ফ্ল্যাটে বাস। পরিবার দেশে থাকেন। ইনি মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। আহার কখনও স্বহস্তে, কখনও বাইরে আবার কখনও কালীঘাটের পাঞ্জাবী হোটেলে, কখনও ব্লু-ফক্স বা স্কাইরুমে। জীবিকা চলচ্চিত্র শিল্প।

কিন্তু এহ বাহ্য। অনেকটা সরকারি কর্মচারীদের বায়োডাটার মতন। বায়োডাটা পড়ে জানার উপায় নেই ইনি কাজের না অকাজের। ইনি সৎ না অসৎ। জানা যায় না অনেক কিছুই। জানা যায় সামান্য। শিশিরদার বাহ্যিক জীবন দেখে জানা যায় না ওর আসল রূপ। চরিত্র। অভিসন্ধি।

শিশিরদা যে ফিল্ম লাইনের লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পৃথিবীতে ফিল্ম ছাড়া আর কোনো বিষয়ে ওর আগ্রহ নেই। অন্য কোনো কিছুর খবরও উনি রাখেন না, জানেন না। কতদিন ধরে ফিল্ম লাইনে আছেন, তা জানা যায় না ; তবে বাংলা ফিল্মের প্রাগৈতিহাসিক যুগের খবর এমন সাবলীলভাবে বলেন যে মনে হয় ম্যাডান কোম্পানির ইনিও একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

'নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে কানন দেবী প্রথম ফিল্মে আসেন। জয়দেব ছবিতে রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কত টাকা পেয়েছিলেন জান?' সিগারেট টানা বন্ধ করে আমাদের দিকে চাইলেন শিশিরদা।

গীতি বলল, 'কত?'

'পঁচিশ টাকা।'

গীতি চোখ বড় বড় করে বলল, 'মাত্র পঁচিশ টাকা?'

'জি, হাঁ। মাত্র পঁচিশ টাকা। তাও কুড়ি টাকা একজন ঠকিয়ে নিয়ে নেয়। কাননদির হাতে পৌঁছেছিল ওনলি ফাইভ রুপিজ।'

'উনি মোটে পাঁচ টাকা পেয়েছিলেন?'

শিশিরদা এবার সিগারেট টেনে একটু মৃদু হাসলেন। 'বিশ্বাস না হবারই কথা। একদিন কাননদির বাড়ি যাও না। বলো, শিশিরদা বলছিলেন আপনি প্রথম ছবিতে কাজ করে মাত্র পাঁচ টাকা হাতে পেয়েছিলেন।'

'জিজ্ঞাসা করলেই যেন উনি স্বীকার করবেন।'

'শিশিরদা আবার হাসলেন। বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞের মতো হাসি। 'কাননদিকে তোমরা চিনতে পারনি। কখনো মিথ্যে কথা বলবেন না। উনি আজকালকার অ্যাকট্রেস না। ওঁর কাছে অভিনয়ের চাইতে জীবন বড়। সী ইজ এ ফিলসফার।'

মজার কথা শিশিরদার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় মেসোমশাইয়ের। দুজনে পাশাপাশি বসেছিলেন একই ট্রেনে। দুজনেই কলকাতা আসছিলেন। মেসোমশাই বেশি কথাবার্তা বলেন না। সব সময়েই আপন মনে সংসারের কথা ভাবেন। সংসারের চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারেন না। কিন্তু শিশিরদা যে আলাপী লোক। চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। উনিই শুরু করলেন আলাপ, এদিকে কি বেড়াতে এসেছিলেন?'

মেসোমশাই দুহাতে ছাতি ধরে বসেছিলেন। ছোট্ট উত্তর দিলেন, 'না আমি কোলফিল্ডে চাকরি করি।'

'অফিসের কাজে কলকাতা যাচ্ছেন?'

'না। আমার বাড়ি কলকাতায়। ফ্যামিলি কলকাতাতেই থাকে বলে রেগুলার যাতায়াত করি।'

'কলকাতার কোথায় আপনার বাড়ি?'

'টালিগঞ্জে।'

শিশিরদা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, 'টালিগঞ্জে? কোথায়?'

'মুর এভিনুর মোড়ে।'

'মুর এভিনুর মোড়ে। আশ্চর্য!'

'কেন কি হলো?' এবার মেসোমশাই আশ্চর্য হলেন।

'আমিও তো ওর কাছাকাছিই থাকি।'

'কোথায়?'

'আপনার ওখান থেকে একটু এগিয়েই নেতাজি সুভাষ রোডে।'

এবার মেসোমশাই খুশি হলেন, 'বাঃ! খুব ভালো কথা। ফ্যামিলি ওখানে থাকে বলে বড়ই চিন্তায় থাকি অথচ পাড়ার বিশেষ কাউকেই চিনি না।'

'না না, চিন্তার কি আছে? দেখাশোনার লোকজন তো আছেন নিশ্চয়?'

মেসোমশাই একবার ঢোক গিলে বললেন, 'আমার স্ত্রী আর মেয়েরাই সব চালিয়ে নেয় তবে ওই নির্মলা হোমিও হলের ডাক্তারবাবুই গার্জেন।'

ডাক্তারবাবুর নাম শুনেই উনি ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি কি আপনার কেউ–'

'কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই তবে পাশাপাশি বাড়ি, দাদা বলে ডাকি। উনিও আমাকে খুব স্নেহ করেন। প্রায় এক ফ্যামিলির মতোই আমরা থাকি।'

ডাক্তারবাবুর সম্পর্কে আরো একটু খবর নেবার প্রয়োজনবোধ করলেন শিশিরবাবু, 'উনি বুঝি ওখানে একলাই।'

'না না, উনি ফ্যামিলি নিয়ে আছেন।'

'আপনার ছেলেমেয়েরা বুঝি ছোট ছোট?'

মেসোমশাই হাসলেন, 'ছেলেই ছোট। তিনটি মেয়ের পর এই ছেলে। ছেলেটা বড় হলে তো অত চিন্তা ছিল না।'

'একদিক থেকে ভালোই। তাড়াতাড়ি ওদের বিয়ে দিলেই মিটে গেল। শেষ জীবনে বেশি দায়িত্ব না থাকাই তো ভালো।'

মেসোমশাই আবার হাসলেন। দুঃখের হাসি. 'দৈনন্দিন সংসার চালাতে গিয়েই হিমসিম খাচ্ছি, তা আবার মেয়ের বিয়ে দেব!'

'অত চিন্তা করছেন কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না মশাই, যা দিনকাল পড়েছে তাতে সংসার চালানো সত্যিই বড় কষ্টকর হয়েছে।'

হাওড়ায় এসে ট্যাক্সি নিলেন শিশিরদা। সঙ্গে মেসোমশাই। জামা-কাপড়, কথাবার্তা, ট্যাক্সি চড়া দেখে মেসোমশাইয়ের মনে বেশ দাগ কাটল।

সেদিন শিশিরদা ওঁকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেলেন। এক কাপ চা খাবার জন্যও নামলেন না। এলেন দু-সপ্তাহ পরে রবিবার সকালে। হাতে এক প্যাকেট সন্দেশ। আট আনাওয়ালা কড়া পাকের আম সন্দেশ।

সেই শুরু। তবে খুব কম আসেন। কদাচিৎ কখনও। এলেই হাতে সন্দেশ বা রসগোল্লা। শনিবার বা রবিবার। মাস তিনেক পর হঠাৎ একদিন সকালে এসে গীতির হাতে সিনেমার ছ'টা পাশ দিয়ে বললেন, 'যাও সিনেমা দেখে এসো।'

শিশিরদা দাঁড়ালেন না। সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলেন। মহাপুরুষদের মতো আকস্মিক আবির্ভাব, আকস্মিক বিদায়! ওরা তো হতবাক। এমন উদার মানুষ এই পাড়াতেই থাকে? সেই পাশে ওদের সঙ্গে মা আর আমিও সিনেমায়

গিয়েছিলাম।

এরপর একদিন রাস্তায় গীতির সঙ্গে ওঁর দেখা।

'কি, সিনেমা দেখলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগল?'

'ভালোই।'

'সবাই গিয়েছিলে?'

'আমরা সবাই ছাড়াও ওবাড়ির মাসিমা আর বেণু গিয়েছিল।'

'বেণু কে?'

'মাসিমার ছেলে।'

'ওঃ!' একটু থেমে আবার প্রশ্ন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ি।'

'কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি?'

গীতি একটু হাসল। 'রেশনের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'রেশন নেওয়া হলো?'

'না। কাল নেব।'

'তাহলে চল আমার বাড়ি ঘুরে আসবে।'

গীতি খুশিই হলো।

শিশিরদার ঘরদোর দেখেই বুঝল অবস্থা মোটামুটি ভালোই। বসবার ঘরের দেওয়ালে ছবি বিশ্বাসের একটা বড় ছবি।

'আপনি বুঝি ছবি বিশ্বাসের খুব ভক্ত?'

'হ্যাঁ, ভক্তই বলতে পার। ছবিদাই আমাকে ফিল্ম লাইনে আনেন।'

গীতি চুপ করে থাকে। শিশিরদা ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করেন। 'বল কি খাবে?'

'এখন কিছু খাব না।'

'আমার বাড়িতে এলে সবাইকেই কিছু খেতে হয়।'

একটু আগেই তো স্কুল থেকে ফিরে খেলাম।'

'তাহলেও সামান্য কিছু তো খাবো।'

গীতি অনেকবার আপত্তি করল। উনি শুনলেন না। 'চল দেখি ঘরে কি আছে। তোমার জন্য এখন আর দোকানে যাচ্ছি না।'

উনিই গীতির হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। শোবার ঘর। সুন্দর খাটে

পরিপাটি বিছানা পাতা। একটা কোণায় লোহার আলমারি। তাছাড়া একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। খাটের পাশে ছোট্ট টুলে একটা টেবিললাইট আর অ্যাসট্রে।

গীতি আরো মুগ্ধ হলো।

টেবিলের উপরের কয়েকটা ঠোঙা ঘাঁটাঘাঁটি করে বললেন, নাও। একটু কাজু আর মিক্সচার খাও। আর কিছু নেই।

কাজু? গীতি যেন ভূত দেখল।

'বিশ্বাস কর বেণু, ওর আগে আমি কোনোদিন কাজুবাদাম খাইনি। আমার ভীষণ লজ্জা করছিল কিন্তু উনি জোর করে আমার হাতে ঢেলে দিলেন।'

রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে লুকিয়ে লুকিয়ে শিশির পড়া শুরু হল। কেউ জানতে পারল না, বুঝতে পারল না, দেখতে পারল না সব কিছু ভিজে যাচ্ছে। তাছাড়া বুঝলেও বাধা দেবার কোনো উপায় ছিল না। উপায় থাকে না।

'সেদিন রেশন আনার লাস্ট ডে! স্কুলে মাইনেও দিতে হবে। অথচ বাড়িতে অত টাকা নেই। দু একজনের কাছে চেষ্টা করেও পাওয়া গেল না। হঠাৎ মা বললেন, হ্যাঁরে একবার ওই শিশিরবাবুর কাছে চাইবি? দিদি আপত্তি করল, কিন্তু আমার মনে হলো হয়তো দিতে পারেন। চলে গেলাম।'

আমি বললাম, 'মার কাছে গেলি না কেন?'

গীতি হাসল, 'তুই তো জানিস না মাসিমার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছি।'

'শিশিরদা দিলেন?'

'হ্যাঁরে এক কথায় দিয়ে দিলেন। চেয়েছিলাম বিয়াল্লিশ টাকা আর উনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন সুবিধে মতো ফেরত দিও। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁরে। আমি অনেকের কাছেই টাকাকড়ি-জিনিসপত্র ধারে নিয়েছি কিন্তু কেউ এমন হাসি মুখে দেয় না।'

সব আগুনের শিখা দেখা যায় না কিন্তু তার দাহ? উত্তাপ? লুকিয়ে থাকতে পারে না। অনুভব করা যায়। শিশিরদার মনের আগুন গীতি দেখতো না, দেখেনি কিন্তু তার উত্তাপ স্পষ্ট অনুভব করতে পারত। হাজার হোক মেয়ে। তারপর বড় হচ্ছে। বড় হয়েছে। ক্লাসের মেয়েদের কাছে কত কি শুনতে পায়। জানতে পায়। কিছু নিজে বুঝতে পারে, কিছু অনুভব, অনুমান করে।

শিশিরদা ভিতরের ঘরে। বাইরের ঘরে বসে গীতি ফিল্ম জার্নালগুলো

ওলটায়। ছবি দেখে। মজার মজার ছবি। এমন ছবি এর আগে কোনোদিন দেখেনি। দেখতে ভারি মজা লাগে। ভালো লাগে। তবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। একলা একলা দেখে। শিশিরদার সামনে দেখে না। দূর থেকে শিশিরদাকে দেখলেই জার্নালগুলো সরিয়ে রাখে। একলা হলে আবার দেখে। এখানে এলেই দেখে। অনেকদিন শুধু ছবি দেখার লোভেই আসে।

তারপর হঠাৎ একদিন–

'দেখেছ গীতি, ওদের দেশের ফিল্ম কত রিয়্যালিস্টিক হয়, কত ন্যাচারাল হয়?

কোনো জবাব দিতে পারে না গীতি। চুপ করে থাকে। মুখ নিচু করে বসে থাকে। শিশিরদা ওর মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'কি হলো জবাব দিচ্ছ না যে?'

শিকারী শিশিরদা অভিজ্ঞ লোক, বুঝতে পারেন ওর দ্বিধা! 'আরে! তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? ফিল্মটাও তো একটা আর্ট। এ নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পাবার কি আছে?'

রাতের অন্ধকারে আরো শিশির পড়ে। জমি আরো একটু সরস হয়। গীতি অনেক সহজ হয়। সব ব্যাপারেই সহজ হয়। খুব তাড়াতাড়ি।

মাসের আধাআধি হতে না হতেই বিনোদবাবুর পরিবারের সঙ্কট শুরু হতো। মা সরাসরি সাহায্য দিতে পারতেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিতেন। প্রয়োজন বোধে দিতেন।

'হ্যাঁরে স্মৃতি, এই শাড়িটা তুই পরিস।' ডোরা কাটা নতুন তাঁতের শাড়িটা স্মৃতিদির হাতে দিয়ে বললেন।

'এই শাড়িটাই তো সেদিন জ্যাঠামণি কিনে আনলেন না?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আমাকে দিচ্ছেন কেন? আপনিই পরবেন।'

'দূর পাগল! আমি এই রকম শাড়ি পরি নাকি?'

স্মৃতিদি মাকে জানত। আর তর্ক করত না। শাড়িটা হাতে করে বাড়ি চলে যেত। একটু পরেই শাড়িটা পরে আবার আসত। বাবাকে মাকে প্রণাম করত।

বাবা শাড়িটা মার জন্যই কিনেছিলেন। আমি জানতাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার শাড়িটা স্মৃতিদিকে দিয়ে দিলে?'

'দেব না? মেয়েটার একটাও আটপৌরে ভালো শাড়ি নেই।'

'তুমি স্মৃতিদিকে একটু বেশি পছন্দ কর, তাই না, মা?' আমি হাসতে হাসতে বলতাম।

'পছন্দ অপছন্দের কি আছে? অত বড় মেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরলে খারাপ লাগে না?'

আমি তর্ক না করে চলে যেতাম। মা মাসিমাকে কবে কত টাকা পয়সা দিতেন, তা আমি জানতে পারতাম না কিন্তু অন্য কিছু দিলে জানতে পারতাম। ভালো মাছ বা মাংস এলে ওদের বাড়ি যাবেই। অনেক সময় বাবাকে পেসেন্টরা মিষ্টি-টিষ্টি দিলে ওদের বাড়িতে অর্ধেক পাঠানো হতো। কিন্তু সংসারের প্রতিদিনের প্রয়োজন এভাবে মিটতে পারে না। গীতিকে যেতে হতো বাদলদার দোকানে, শিশিরদার ফ্ল্যাটে। এটা এখন ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম। স্কুলের পড়াশুনার চাইতে সংসারের কাজকর্মই গীতির কাছে বড় ছিল। সপ্তাহে অন্তত দুদিন স্কুল যাওয়া হতো না। এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় রেশনের দোকান থেকে ফিরলে স্কুলে যাবে কী করে?

রান্নাঘর থেকে মাসিমা ডাক দিলেন, এই গীতি!

'কী বলছ?'

'একটু তেল আনতে পারিস?'

'শুধু তেল?'

'আর একটু মুসুরীর ডাল।'

'একটু পরে যাব।'

'পরে রোদ্দুর আরো বাড়বে ; এখুনি যা।'

'বলেছি না, অন্য খদ্দেরের সামনে বাদলদা ধার দিতে চায় না।'

বাদলদা কিছু মালপত্তর ধারে দিলেও কিছু নগদ চাইত। নিত। ছলে-কৌশলে আদায় করত। দোকানের সামনের পাল্লা বন্ধ হলেও পাশের দরজা খোলা থাকত। গীতি নিতান্তই অসময়ের ওই পাশের দরজা দিয়ে দোকানে ঢুকত। বাদলদা তখন খদ্দেরদের বিদায় করে পিছনের তক্তপোষে ঘাম প্যাচপেচে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হাত পাখার বাতাস খাচ্ছে।

'কি বাদলদা, শুয়ে আছ?'

'তবে কি তোর জন্য বসে থাকব?'

বাদলদার কথাবার্তার ধরনই এই রকম। গীতি মনে কিছু করল না। একবার অন্ধকার দোকান ঘরটা দেখে ছোট্ট দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল। ও-পাশের গম ভাঙার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সাড়ে তিনটে-চারটের পর আবার খুলবে। এই সময়টুকু বাদলদার নিজের। একান্ত নিজস্ব। দু'চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা গীতির মতো কিছু ধারের খদ্দের। কিছু বিশ্রাম, কিছু মনোরঞ্জনের

সময়।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' ব্যবসাদারী কর্কশ গলায় বাদলদা জিজ্ঞাসা করল।

'হা করে দাঁড়িয়ে আছি কোথায়?'

'এদিকে এসে বোস্।'

'বসার সময় নেই। একটু তেল আর ডাল নিয়েই পালাব।'

'সময় নেই তো এখুনি ভাগ।' বাদলদার সোজা হিসেব।

গীতি বাদলদাকে ভালোভাবেই জানে। চেনে। অবাক হয় না ওই ধরনের কথায়। বাদলদাকে ছুঁতে ওর ঘেন্না করে। কাছে যেতে ভয় করে। লজ্জাও করে। অথচ দূরে থাকাও সম্ভব নয়। সংসারের প্রয়োজন। অবশ্য প্রয়োজন। বিনোদবাবু রোজগার করলেও সংসার চালাতে হয় ওকে। এক টাকা-দুটাকা-পাঁচ টাকা তো হরদমই ধার করতে হয় পাড়ার এর-ওর কাছ থেকে। সেগুলো নিয়মিত নয়, অনিয়মিত। এখন কদাচিৎ। শিশিরদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর ওদের কাছে বিশেষ হাত পাততে হয় না। তবে বাদলদার কাছে আসতেই হয়। প্রতিদিন না হলেও রীতিমতো নিয়মিত। প্রতি সপ্তাহে দু'একদিন তো নিশ্চয়ই। কখনও আগের ধার শোধ করে নতুন ধার নেবার জন্য অথবা ধারের পর ধার নেবার জন্য।

গীতি বাদলদার চৌকির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'বলো কি বলছ?'

'চৌকিতে বসলে কি তোর জাত যাবে?'

'জাত যাবে কেন?'

'তবে বসছিস না কেন?'

বাড়িতে এক ফোঁটা সরষের তেল নেই। তেল না হলে ওবেলায় রান্না হবে না। ডালও বাড়ন্ত নিশ্চয়ই। মাছ থাকলে ডাল না হলেও চলে কিন্তু মাছ কোথায়? ডাল নিতেই হবে। বেশ কিছু টাকা খরচা করে বাড়িতে একটা টিউবওয়েল বসাবার পর সংসারে অভাব আরো বেশি বেড়েছে। বিনোদবাবু মাইনের টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে এই টিউবওয়েল বসিয়েছেন। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা কাটছে। ওই টিউবওয়েলটার ওপর গীতির বেশ রাগ। ওই ঘাম প্যাচপেচে বাদলদার পাশে বসার চাইতে রাস্তার কল থেকে জল বয়ে আনা যেন অনেক ভালো ছিল।

গীতি বাদলদার চৌকিতে বসল।

বাদলদা সঙ্গে সঙ্গে ওর, ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। 'তোর বাবা কোথায়?'

'কোলিয়ারীতেই।'

'শনিবারে শনিবারে আসেন?'

'হ্যাঁ।'

'আবার রবিবারেই চলে যান?'

'না। সোমবার ভোরে যান।'

'উনি কলকাতায় একটা চাকরি পান না?'

'জানি না।'

বাদলদা হাতের মুঠোয় গীতির হাতটা নিয়ে আপন মনেই বলল, পেলে খুব ভালো হত। ভদ্রলোকের খাটুনি কমত।

গীতি কিছু জবাব দেয় না।

বাদলদা নিরুৎসাহ হয় না। আবার শুরু করে, 'তোর দিদির বিয়ের কিছু হলো?'

'হলে জানতেই পারতে।'

'আচ্ছা তোর দিদির কত বয়স হল রে?'

'ঠিক জানি না।'

'বিয়ের বয়স তো অনেকদিন হয়ে গেল...'

কথাবার্তা অসহ্য মনে হয়। তবুও পাথরের মতো চুপটি করে সব শোনে। সহ্য করে। বাড়িতে সবাই ভাবে দোকানে যাতায়াতের পথে বা দোকানে গিয়ে ও আড্ডা দেয়। আসল কথা কেউ জানতে পারে না। গীতি জানায় না। জানাতে পারে না। দিদির মতো বিয়ের বয়স না হলেও ও বেশ বড় হয়েছে। ওর বয়সী অনেক মেয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরে। ও ফ্রক পরে। চোখে একটু খারাপ লাগলেও পরে। শাড়ি পরার অনেক ঝামেলা, অনেক খরচ।

এক নিশ্বাসে সব কিছু বলছিল গীতি। এবার একটু থামল। ডান হাত দিয়ে হঠাৎ আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তুই কিছু মনে করবি না তো?

'না, না। কি আবার মনে করব?'

'দশ-পনের মিনিট বাদলদার কাছে না বসলে কিছুতেই জিনিসপত্র দিত না...'

মাঝপথে জানতে চাইলাম, 'তাতে কি হল?'

'শুধু বসলে তো কিছু ক্ষতি ছিল না কিন্তু ভীষণ বদমাইসী করত, অসভ্যতা করত অথচ...'

অথচ উপায় ছিল না। কোনো উপায় ছিল না। কাছাকাছি আর কোনো দোকানে ধার পাওয়া যায় না। বহুবার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। বাদলদার কাছে না এসে উপায় নেই। তাছাড়া প্রায় হাঁড়ি-কড়া চাপিয়ে আসে। বাদলদার অসভ্যতা, আজে-বাজে কথা সহ্য করেও জিনিসপত্র নিতে হয়। দোকান থেকে ফিরে যেতে হয়। মাসিমা রেগে যান। 'এতক্ষণ কি করছিলি বল তো? তোর দোকানে যাওয়া মানেই ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার।'

গীতিও খিঁচিয়ে ওঠে, 'কত কাণ্ড করে ধারে জিনিসপত্র আনতে হয়, তা একবার নিজেরা গিয়ে দেখ না!'

মাসিমা চুপ করেন। এ কথার কোনো জবাব নেই। গীতি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এসব হবে না। তাছাড়া এতদিন ধরে বাজার-হাট করার জন্য ওকে কেউ ঠকাতে পারে না। গোনাগুন্তি পয়সা থেকেও মাঝে মাঝে কিছু বাঁচিয়ে এটা-ওটা আনে। সংসারের স্বার্থের প্রতি ওর সতর্ক দৃষ্টি। মাসিমা কী বলবেন?

সংসারের জন্য গীতির পড়াশুনা হলো না। নাইনে উঠেছিল কিন্তু আর এগুতে পারল না। স্মৃতিদি ম্যাট্রিক দিয়ে পাস করতে পারেনি। গীতি পড়াশুনায় খুব ভালো না হলেও বিশেষ খারাপ ছিল না। হয়তো সেকেন্ড ডিভিশনেও পাস করতে পারত। সংসার সামলাতে গিয়ে ওর আর পড়াশুনা হলো না। দুপুরবেলায় বাদলদা আর শিশিরদার কাছে ধার চাইতে গেলে কি আর স্কুলে যাওয়া যায়? বাদলদার দোকানে গেলে পনের-বিশ মিনিট বা আধঘণ্টায় মুক্তি পাওয়া গেলেও শিশিরদার ওখানে তা হতো না। সাধারণত দশ-পনের টাকার বেশি চাইত না। সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেলেও বাড়ি ফিরতে পারত না। সচ্ছল মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে দশ-পনের টাকা এমন কিছু না হলেও ওদের কাছে এর দারুণ মূল্য ছিল। প্রয়োজনের জন্যই মূল্য বেশি ছিল। শিশিরদাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না। চাইত না। তাছাড়া দিনে দিনে ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

'আচ্ছা শিশিরদা, ফিল্মে প্রোডাক্‌শন ম্যানেজারের কাজ কি?'

'ফিল্মের সুটিং-এর জন্য যা যা দরকার তার সবকিছুর ঠিকমতো ব্যবস্থা করাই প্রোডাক্‌শন ম্যানেজারের কাজ।'

'ফিল্ম, ক্যামেরা, আর্টিস্ট...'

'না, না, ওসব না।...'

'তবে?'

'ধর একটা অপারেশন থিয়েটারের সুটিং হবে স্টুডিওতে! এই অপারেশন

থিয়েটারকে ঠিকমতো সাজাবার জন্য যা যা দরকার তা প্রোডাক্শন ম্যানেজারকে জোগাড় করতে হবে।'

'কোথা থেকে জোগাড় করবেন?'

'যেখান থেকে হোক।'

'দোকান থেকে কিনবেন?'

'কিনলে তো অনেক টাকা লাগবে। কোনো না কোনো জায়গা থেকে ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'যদি জোগাড় করতে না পারেন?'

শিশির হেসে ওঠেন। 'ওসব যদি-টদি চলবে না। আঁতুড় ঘর থেকে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত ফিল্মে যা যা থাকবে তা সব আমাদের জোগাড় করতেই হবে।'

'জোগাড় করতে পারেন?'

এবার হাসতে হাসতে গীতির গলাটা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি সব কিছু জোগাড় করতে পারি। এইতো তোমাকে জোগাড় করেছি।'

এই পাড়ার যারা স্টুডিওতে যাতায়াত করে, দুটো-একটা সিনে অভিনয় করে, তাদের কাছে শুনেছে প্রোডাক্শন ম্যানেজাররা প্রচুর টাকা মারে। একটা ফিল্মে হাজার রকমের ছোট-বড় জিনিস লাগে। সব জিনিসে দুচার টাকা করে মারলেও বেশ কয়েক হাজার টাকা প্রোডাক্শন ম্যানেজারের পকেটে আসে। রেখা না কে যেন বলেছিল কোনো একটা ফিল্মে বিয়ে বাড়ির সিনের জন্য চারটে কলা গাছ কিনতে শিশিরদা আশি টাকা ব্যয় করেছিলেন। কলা গাছের কথা বলতে ডাইরেক্টর ভুলে গিয়েছিলেন বলে শিশিরদা সুযোগ ছাড়েননি। তাছাড়া ক্রাউড সিনের এক্সট্রা জোগাড় করা তো আছেই। মাথা পিছু পাঁচ টাকা পকেটস্থ করলেও কয়েক হাজার টাকা হয়।

গীতি মনে মনে ভাবে ফিল্মের জিনিসপত্র জোগাড় হবে না, তাই কি হয়? এই কলকাতা শহরে টাকা দিতে পারলে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। শুধু মনে মনে ভাবে না মুখেও বলে। আস্তে আস্তে শিশিরদার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। টুক-টাক ঠাট্টা-ইয়ার্কিও হয়। একটু মুচকি হেসে বলল, 'সত্যিই তো, আপনার মতো লোক জোগাড় করতে পারবে না তাই কি হয়?'

শিশিরদার ডান হাত গীতির গলা থেকে আস্তে আস্তে নামতে থাকে। গীতি আপত্তি করে, 'আঃ! কি করছেন?'

'কি করছি?'

'হাত সরান।'

'কেন?'

'ভীষণ অস্বস্তি লাগছে।'

'এই বয়সে গায়ে হাত দিলে অস্বস্তি লাগে নাকি?'

'আমার লাগে।'

'আস্তে আস্তে অভ্যাস হোক। এরপর তো...'

শিশিরদা থামেন। হাসেন। নতুন ধরনের হাসি।

গীতি জিজ্ঞাসা করে, 'এরপর তো, কি?'

'জান না?'

'না।'

'জানতে চাও?'

'দরকার নেই।'

গীতির অনেক কিছুই দরকার ছিল না কিন্তু তবুও শিখতে হয়েছে, জানতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে। নানা অবস্থায় বহুজনের কাছ থেকে জানতে হয়েছে। নিজের তাগিদে নয়, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। স্মৃতিদির মতো ও যদি বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শে না আসত তাহলে ওসব জানার সুযোগ আসত না। দরকার হতো না।

শিশির সরকার যে সুবিধের লোক নয়, তা বুঝতে গীতির সময় লাগেনি। সন্ধ্যার পর ও আসত না। কিন্তু সকালে এসেও জানতে পারত রাত্রে উনি ড্রিংক করেন। মদ খান। শোবার ঘরের টেবিলে বোতল গেলাস থাকত। অ্যাশট্রে উপচে পড়ত পোড়া সিগারেটের টুকরো। প্রথম প্রথম ভাবত বোধহয় ওষুধ। তারপর নিজের মনেই দ্বিধা এলো। বোতল বোতল ওষুধ কেউ খায় নাকি? তাছাড়া এতোগুলো গেলাস কেন? একজনের ওষুধ খেতে এত গেলাস লাগবে কেন? কিছুকাল পরে না জিজ্ঞেস করে পারল না। 'আচ্ছা শিশিরদা, রোজ আপনার টেবিলে এত বোতল-গেলাস থাকে কেন?'

'তুমি জান না?'

'জানলে কেউ জিজ্ঞাসা করে?'

'বন্ধুবান্ধব আর পাড়ার দুচারজন মিলে আনন্দ করি।'

'তার মানে?'

'এই একটু হুইস্কি খেতে খেতে আড্ডা হয়।'

'হুইস্কি মানে মদ?'

শিশিরদা হাসলেন। 'তুমি তাও জান না?'

'না।'

'একদিন তোমাকে খাওয়াবো।'

গীতি লাফ দিয়ে ওঠে, 'না, না, আমি খাব না।'

শিশিরদা ওর হাত ধরে টেনে কাছে বসান, 'আচ্ছা খাওয়াবো না। বলেছি বলেই পালাচ্ছ কেন?'

গীতিদি কোনোদিন খায়নি তবে প্রস্তাব, অনুরোধ-উপরোধ এসেছে বহুবার। 'এত ভয় পাবার কিছু নেই। ফলের রস দিয়ে তৈরি হয়। একটু-আধটু খেলে শরীর ভালো হয়।'

'শরীর ভালো হয় না কচু হয়!'

'সত্যি বলছি। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

তবু ও খায়নি। ও জানে সন্ধ্যার পর এখানে আসর জমে। ফিল্ম লাইনের কিছু লোক ছাড়াও পাড়ার অনেকেই মাঝে মাঝে আসেন। এই বাড়ির বাড়িওয়ালা শিবদাসবাবু নাকি রোজ আসেন। দু'চারজন ফিল্ম একস্ট্রারাও আসে। কেউ মেয়ে, কেউ ছেলে। বড় রোল পাবার আশায় আসে। আড্ডা দেয়। ড্রিংক করে। পাড়ার গুজব শিশিরদা একা ঘুমুতে পারেন না। কষ্ট হয়। সুযোগ পেলেই শিকার করেন। ফিল্মে নামার জন্য রেখার মতো বহু মেয়েই পাগল। নাম, খ্যাতি, অর্থের জন্য ওরা সব কিছু করতে পারে। করতে চায়। করে। শিশিরদার কাছে রাত কাটাতেও পারে। কাটায়। গুজবের প্রমাণ গীতি পেয়েছে। বহুবার। বহুভাবে। বিছানায় চুলের কাঁটা তো হরদম দেখে। প্রথম প্রথম দেখে অবাক হতো।

'একি শিশিরদা, আপনার বিছানায় মেয়েদের চুলের কাঁটা?'

ঘাবড়ে যাবার পাত্র উনি নন। 'কাল আমার এক মাসতুতো বোন আর ভগ্নিপতি এসেছিল। রাত্রে ছিল। ওরই হবে।'

গীতি বিশ্বাস করেছিল! কদিন পর আবার দেখল। আবার প্রশ্ন করল। জবাব পেল। এখন আরো কত কি দেখে! তবু প্রশ্ন করে না। উত্তরও চায় না।

বাড়িতে কাউকে এসব বলে না। বলার দরকার মনে করে না। তাছাড়া যে উপকার করে তার নিন্দা করা ও পছন্দ করে না। স্মৃতিদি হয়তো একটু সন্দেহ করত। 'হ্যাঁরে, তুই শিশিরদার ওখানে গিয়ে এতক্ষণ কি করিস?'

'কি করব? একটু গল্প-গুজব করি।'

'আর কেউ থাকে?'

'না। আর কে থাকবে?'

স্মৃতিদি একটু চুপ করে আবার জানতে চায়, 'আচ্ছা উনি কেমন লোক রে?'

'কেমন আবার? ভালোই।'

'তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন?'

'খারাপ হলে কেউ কথায় কথায় টাকা ধার দেয়?'

স্মৃতিদি আর কথা বলতে পারে না! চুপ করে যায়। শেষে শুধু বলে, 'হাজার হোক তুই বড় হচ্ছিস। বেশি বাইরে বাইরে থাকিস না।'

'তুই বাইরের কাজ কর। তাহলেই আমি বাড়ি বসে থাকব।'

স্মৃতিদিও বাইরের কাজ করেনি, গীতিও ঘরে বসে থাকেনি। বরং শিশিরদার ওখানে আড্ডা দেওয়া আরো বেড়েছে। আড্ডা দিতে ভালো লাগত। মজা লাগত। রস পেত। না গেলে ভালো লাগত না। তাছাড়া বাড়িতে বসে কতক্ষণ কাটানো যায়?

তারপর। কয়েক বছর পর। হঠাৎ গীতি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মা আর টেনু বাড়ি ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। বাবা তখন ডিসপেন্সারিতে। আমি একা ছিলাম। কলেজ লাইব্রেরির একটা বই পড়ছিলাম। ও আমাকে একা পেয়ে দারুণ ফাজলামি শুরু করল। না, না, ফাজলামি নয়, অসভ্যতা। ইয়ার্কি। অসম্ভব। আমি অনেকবার বারণ করেও কোনো ফল হলো না। ওর মাথায় যেন সেদিন ভূত চেপেছিল।

'কি করব বল বেণু? বাদলদা শিশিরদাকে দারুণ ঘেন্না করে অথচ ওদের জন্য আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করতাম। দারুণ অস্বস্তি। তোকে বোঝাতে পারব না। তারপর সেদিন হঠাৎ তোকে একলা পেয়ে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না।'

গীতির যে ইতিহাস কেউ জানে না, জানবে না, সেই কাহিনি বলে মাথা নিচু করে আমার পাশে বসে রইল। অনেকক্ষণ। আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

'জানিস বেণু, তোকে না পেলে ওরাই আমার সর্বনাশ করত। বহু মেয়ের সর্বনাশ ওরা করেছে...'

গীতি আর বলতে পারল না।

ওকে কোনোদিনই আমার ভালো লাগত না। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে ওকে আমার দারুণ ভালো লাগল। কাছে টেনে নিয়ে আদর করলাম।

অনেকক্ষণ আদর করলাম।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই ও আমাকে পেত, আমি ওকে পেতাম। সময় সুযোগ পেলেই পেতাম। না পেলে ভালো লাগত না। ওর না, আমারও না। গীতির মতো আমারও রক্তে নেশা লাগল। শিশিরদা খারাপ, একথা সবাই জানত কিন্তু আমি খারাপ, কেউ জানত না। কেউ সন্দেহ করত না। ভালো ছেলে বলে সবাই আমাকে ভালোবাসত। স্নেহ করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দুজনে গল্প করলেও কেউ কিছু খারাপ ভাবত না। সন্দেহ করত না।

ইন্টার-কলেজিয়েট ফুটবল লীগের ফাইন্যাল খেলার জন্য একটার সময় কলেজ ছুটি হয়ে গেল। আড়াইটা-তিনটার সময় বাড়ি ফিরে এলাম। বইপত্তর রেখে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল মার ডাকাডাকিতে।

'আমি দিদির সঙ্গে টেনুকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি। গীতি তোকে চা করে দিচ্ছে। আমি সব রান্না-বান্না করে গেলাম। তোর ক্ষিদে লাগলে বলিস ও তোকে রুটি করে দেবে। বুঝলি?'

না বোঝার কিছু নেই। এমন তো মাঝে মাঝেই হয়। বললাম, 'আচ্ছা।'

মা, মাসিমা আর টেনু চলে গেল 'রানী রাসমণি' দেখতে। মোটামুটি সব বাংলা সিনেমাই মা দেখেন। মাসিমাকে সব সময় সঙ্গে নিয়ে যান। মার সিনেমা যাওয়া মানেই স্মৃতিদি বা গীতি আমাকে খেতে দেয়। আজ স্মৃতিদি ওদের সংসার সামলাচ্ছে বলে গীতি মার সংসার সামলাতে এসেছে।

মা চলে যাবার পর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এবার ঘুম ভাঙল গীতির ডাকে। 'এই বেণু, ঘুমুচ্ছিস কেন? ওঠ।'

'কেন?'

'চা খাবি না?'

'না।' চোখ বুজে বুজেই জবাব দিলাম।

কিন্তু কতক্ষণ? আগ্নেয়গিরির পাশে কতক্ষণ ঘুমান যায়! চোখ বুজে থাকা যায়! চোখ মেলে তাকালাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও বকুনি দিল, 'সবাই চলে গেছে আর তুই ঘুমুচ্ছিস?'

আমি হাসলাম।

'হাসছিস কেন?'

'তোর পাগলামি দেখে হাসছি।'

'তুই পাগলামি করিস না?'

'তোর পাগলামি থামাবার জন্য আমি পাগলামি করি।'

ও হাসতে হাসতে বলল, 'তুই বুঝি আগে পাগলামি করিস না?'

হাসি চেপে বললাম, 'না।'

ও আমার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুহাতে গলা চেপে ধরে বলল, 'না?'

'না।'

'সেদিন পিছনের বাগানে কে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল?'

আমার হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। 'হ্যাঁরে, ডিসপেন্সারির দিকের দরজা খোলা নেই তো?'

'না।'

'পিছনের দরজা?'

'বন্ধ।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁরে, বাবা হ্যাঁ। আমি অত কাঁচা মেয়ে না।'

ও আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কনুইতে ভর দিয়ে আমার সামনে ঝুঁকে বসে আছে। আমি বললাম, 'তা জানি।'

'আর কি জানিস?'

'অনেক কিছু। সব কিছু।'

'আমি বুঝি তোর সব কিছু জানি না?'

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যা হলো। ও উঠে গিয়ে রান্নাঘরের আর ভিতরের বারান্দায় আলো জ্বেলে দিল। আবার আমার ঘরে, আমার কাছে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ঘরের আলো জ্বালবি না?'

'না।'

'কেন?'

'কেন অন্ধকার খারাপ লাগছে?'

ওই অন্ধকারের মধ্যেই দুজনে এক হয়ে মিশে গেলাম। খারাপ লাগবে কেন?

'হ্যাঁরে গীতি, তুই আমার কাছে এলেই আর নিজেকে সামলাতে পারিস না কেন রে?'

আমার পাশে শুয়ে শুয়ে ও বলল, 'কেন রে? তুই রাগ করিস?'

আমি গম্ভীর হয়ে জবাব দিলাম, 'রাগ করি না কিন্তু পাগলামি করা কি ঠিক হচ্ছে?'

'জানি না, তবে...'

'তবে কি?'

'শিশিরদা-টিশিরদা আমার সঙ্গে এমন অসভ্যতা করে, ওদের ওখানে আমি এমন সব দেখি, শুনি যে তোর কাছে এসে পাগলামি না করে পারি না।'

'ওদের কাছে পাগলামি করিস না?'

'না।'

'কেন?'

'ঘেন্না করে।'

'ওরা ছেড়ে দেয়?'

'দিতে চায় না, তবু আমি চলে আসি।'

'তুই কিছু বলিস না?'

'বলেও কোনো ফল হয় না।'

'কেন?'

'ধারে এক পো সরষের তেল নিতে গেলেও ওই বাদল হারামজাদা একবার গায়ে হাত না দিয়ে ছাড়ে না–'

'আর শিশিরদা?'

'উনি কোনোদিন আমাকে মডেলিং শেখাতে চান, কোনোদিন মেক আপ নেওয়া শেখাবেন। কোনোদিন আবার ব্লাউজের কাটিং দেখাবেন।'

আমি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে শুয়ে আছি। ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুই চাকরি-বাকরি করলে আর ওই জানোয়ারগুলোর কাছে হাত পাততাম না।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম।

গীতি উঠে বসল। 'চা খাবি?'

'খাব।'

ও আমাকে অন্ধকার ঘরে রেখে বেরিয়ে গেল।

ছয়

স্মৃতিদির বিয়ের পর ওদের সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হলো। বাবা বোধহয় হাজার খানেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বাকি টাকা সংগ্রহ করতে মেসোমশাইকে গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবতে হয়। অফিস থেকে অ্যাডভান্স, কো-অপারেটিভ থেকে লোন ছাড়াও সহকর্মীদের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়েছিলেন। না নিয়ে কোনো উপায় ছিল না। তাইতো ওই বিয়ের পর গীতির দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। বেড়ে গেল ওর বিচরণ ক্ষেত্র। বিস্তৃত হলো ওর পরিচিতের সংখ্যা।

পণ্ডিত মশাইয়ের মেয়েদের মতো গীতিও এখন বহু আলোচিত। নানাজনে নানা কথা বলে, ভাবে। আমার পুরনো বন্ধুবান্ধবরাও বলে। সব কথা আমার কানে আসে না, তবে কিছু কিছু আসে। কিছু কিছু শুনি। অপরেশ আমার সঙ্গে ক্লাস থ্রি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়েছে। পড়াশুনায় কোনোকালেই ভালো ছিল না। তবে ভালো ফুটবল খেলত। স্কুল টিমে ছাড়াও পাওয়ার লীগে খেলত। খেলার জন্যই পড়াশুনা হলো না। তাছাড়া রোজ খেলার পর আড্ডা দিয়ে বেশ রাত করে বাড়ি ফিরত। এই আড্ডা দিতে দিতে বেশ কিছু আজে-বাজে বন্ধু জুটে গেল। পড়াশুনা গোল্লায় গেল। হরি ঘোষের চায়ের দোকানই ওর ঘরবাড়ি হয়ে উঠল। হায়ার সেকেন্ডারী পাস করল না। কিছুকাল বসে থাকার পর শেষ পর্যন্ত বেহালার একটা ছোট্ট কারখানায় ঢুকেছে।

পাড়ার সবাই জানে অপরেশ গোল্লায় গেছে। হরি ঘোষের দোকানে বসে খালি ফাজলামি করে। মেয়েদের টিটকারি দেয়। এসব অভিযোগের অনেকটাই ঠিক। তবে আমাকে ভালোবাসে, খাতির করে। সেদিন ট্রাম ডিপোর মোড়ে ওর সঙ্গে দেখা। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি এলাম। অনেক কথা হলো। স্কুলের কথা, বলাইবাবুর কথা, আমার কলেজের কথা, ওর চাকরির কথা। তারপর হঠাৎ কথায় কথায় গীতিদের কথা উঠল।

অপরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, ওর দিদির বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'গীতি এত ঘুরে বেড়ায় কেন রে!'

'মেসোমশাই তো বাইরে চাকরি করেন। তারপর বাড়িতে কোনো বড় ছেলে নেই বলে ওকেই সংসারের সব কাজকর্ম করতে হয়।'

'না রে। ও বড্ড আজে-বাজে ঘুরে বেড়ায়।'

আমি ওকে বোঝালাম যে ছেলেদের কাজ মেয়েরা করলে বড় বেশি নজর পড়ে। একটা ছেলে দশবার বাজারে যাক, কেউ খেয়াল করবে না কিন্তু একটা মেয়ে একবার বাজারে গেলেই সবার নজর পড়ে।

অপরেশ তবু মানল না।– 'তুই তো সারাদিন পড়াশুনা নিয়ে মেতে থাকিস, তাই ঠিক বুঝবি না।'

আমি হাসলাম। 'আমি শুধু পড়াশুনায় মেতে থাকি?'

অপরেশ আবার বলল, তোরা তো প্রায় ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছিস, তাই তোকে বললাম। তুই একটু খেয়াল রাখিস।

আমি আবার হাসলাম। 'খেয়াল রেখে কি করব? ওদের সংসারের দায়-দায়িত্ব তো নিতে পারব না।'

'তা ঠিক তবুও...'

'সংসারের জন্য মেয়েটা যে কি করে তা তুই ভাবতে পারবি না। ওকে বাইরে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে হালও ও খারাপ কিছু করবে না।'

'তুই শিশিরদাকে চিনিস না। কেউটের চেয়েও মারাত্মক।'

'কেউটেও তো সাপুড়ের কাছে জব্দ হয়।'

অপরেশ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, 'তোর সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল। আজ চলি। আমাদের ওদিকে আসিস।'

ঠিক এমন সময় টেনু এসে বলল, অপরেশদা, যাবেন না। মা বসতে বললেন।

একটু পরে মা চা-জলখাবার নিয়ে আসতেই অপরেশ মাকে প্রণাম করল।

'কেমন আছেন মাসিমা?'

'ভালো। তুমি কেমন আছ?'

'এই চলে যাচ্ছে এক রকম।'

'বাড়ির সব ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা গল্প কর।' মা চলে গেলেন।

চা-টা খেয়ে অপরেশও চলে গেল।

পাড়ার আরো কয়েকজন আমাকে গীতির কথা বলেছে। নালিশ করেছে। ওরা সবাই মনে করে আমি, আমার মতো ভালো ছেলে, একটু নজর দিলেই ও ভালো হয়ে যাবে। মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে হাসি। অবাক হই বিস্মিত হই। কেউ ভাবতে পারে না আমি খারাপ হতে পারি। হয়েছি। আমি পড়াশুনায় ভালো। আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়াই না। হরি ঘোষের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিই না। লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খাই না। আমি কি কখনও খারাপ হতে পারি? অসম্ভব। কল্পনাতীত। যারা লেখাপড়ায় খারাপ, যারা বিড়ি-সিগারেট খায়, চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, তারা সবাই খারাপ। আমি যে সবার অলক্ষ্যে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি, তা কেউ দেখছে না, জানছে না, ভাবছে না। ভারি মজার ব্যাপার। অথচ আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার মধ্যে একটা নেকড়ে, একটা কেউটে লুকিয়ে আছে। শিকারের সুযোগ এলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। আমি দারুণ লোভী হয়েছি। রক্তের লোভ। যৌবনের লালসা আমাকে ভাসিয়ে নিচ্ছে যাচ্ছে। পাড়ার অনেক ছেলে সবাইকে জানিয়ে খারাপ হচ্ছে। সবাই ওদের সমালোচনা করে, নিন্দা করে। আমি খারাপ হয়েছি, হচ্ছি, একথা কেউ জানে না। জানতে দিই না। পাড়ায়, কলেজে কোথাও না। খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করি। রেজাল্ট ভালো করতেই হবে। তাহলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। আমি সেইজন্য ভদ্রতার আবরণ দিয়ে নেকড়েকে লুকিয়ে রাখতে পারব।

সামন্তদার মা মারা গেলেন বিকেলের দিকে। খবর পেয়ে পাড়ার সবাই ছুটে গেলেন। আমরাও। মাসিমাও। হরি ঘোষের চায়ের দোকান খালি করে সুধীর, মধু, বলাই, হৃষিকেশ ও আরো অনেকে এল। আমার বন্ধু-বান্ধবরা শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলো। আমিও যেতে চাইলাম কিন্তু ওরা বারণ করল। 'না, না, তোর যেতে হবে না। পরীক্ষার আগে কেন পড়াশুনার ক্ষতি করবি? আমি গেলাম না। আমি ভালো ছেলে হয়ে রইলাম আর ওরা খারাপ বলে সামন্তদার মাকে নিয়ে শ্মশানে গেল।

ছ নম্বর বাসে ধাক্কা খেয়ে বাণী মন্দিরের একটা বাচ্চা মেয়ে ছিটকে পড়লে হরি ঘোষের চায়ের দোকান থেকে ছুটে এসে মধু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল বাঙুর হাসপাতালে। ওর জামা-প্যান্ট রক্তে ভিজে গিয়েছিল। ওই হরি ঘোষের চায়ের দোকানের ছেলেরাই মেয়েটার জন্য কত কি করল! ওদের জন্যই তো মেয়েটা বাঁচল।

তবুও ওরা খারাপ, আমি ভালো।

ওরা কতদিন ধরে কি নিদারুণ পরিশ্রম করে সার্বজনীন দুর্গাপুজো করে। দরজায় দরজায় চাঁদার জন্য ঘুরে বেড়ায়। সারারাত জেগে প্যান্ডেল সাজায়। পুজো ম্যানেজ করে, প্রসাদ বিতরণ করে। রাত্রে কালচারাল প্রোগ্রাম করে। আরো কত কি করে। বিজয়ার দিন নিজেরাই ঘাড়ে করে প্রতিমা তোলে লরিতে। আমরা দুচার টাকা চাঁদা দিই, অঞ্জলি দিই, প্রসাদ খাই ; কালচারাল প্রোগ্রাম উপভোগ করি। আর? সমালোচনা করি। ওরা বদমাইস। আমরা সব সাধু।

মহাষ্টমীর দিন ওই ভিড়ের মধ্যে মা কোনোমতে পুজো দিয়ে চলে আসেন। হৃষিকেশ ঠিক এসে খবর দেবে, 'মাসিমা চলুন। এবার অঞ্জলি হবে।' ভিড়ের জন্য প্রসাদ নিতে না পারলে পরে আমাকে বা টেনুকে দিয়ে দেয়, 'এই, প্রসাদটা নিয়ে যা। মাসিমা নিয়ে যাননি।'

বাদলদার সঙ্গে ওদের দারুণ ভাব। ওর দোকানে বসে এরা সবাই আড্ডা দেয়। চা-সিগারেট খায়। ইয়ার্কি-বাঁদরামীও করে। কিন্তু মহীতোষবাবুর ছোট ছেলেটা টফি কিনতে এসে একটা টফি বেশি নেওয়ায় বাদলদা ওকে ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল। ছেলেটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই ছুটে এসেছিল বাদলদার দোকানে। 'দেখ বাদলদা, বাচ্চাদের গায়ে হাত দেবে তো তোমার দোকান লাটে তুলে দেব।'

'চুরি করলে আদর করবো?'

'অতটুকু দুধের বাচ্চাকে মেরে গলাবাজী করতে লজ্জা করছে না?'

'যা, যা। তোরা নিজের চরকায় তেল দে। আমার এখানে ফোপরদালালী করতে আসিস না।'

ব্যস! আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাদলদার উপর। বাদলদাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

'ওকে আরো দুটো টফি দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দাও নয়তো পেঁদিয়ে বিন্দাবন দেখাব।'

বাদলদা মুখটি বুজে চুপটি করে ওদের কথা শুনেছিল।

এসব সত্ত্বেও লোক ওদের খারাপ বলে। আমাকে ভালো বলে।

চমৎকার!

দিনগুলো বেশ কাটছে। মাঝে মাঝে সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডের চায়ের দোকানেও যাই। তবে কম। ভয় লাগে। আমার ভালো ছেলের খোলসটা না

খুলে যায়। যখন লোভ সামলাতে পারি না, তখনই যাই। আমার এখন দারুণ লোভ। লুকিয়ে লুকিয়ে ফুর্তি করতে খুব ইচ্ছে করে। লোভ হয়।

সেদিন থেকেই গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। কলেজ নেই বলে খুব ঘুমুচ্ছি। কলেজ নেই বলে আর কেউ ডাকাডাকি করেনি। হঠাৎ টেনুর ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙল। 'এই দাদা, শিগগির ওঠ, মাসিমা ডাকছেন।'

চোখ খুলে দেখি অনেক বেলা হয়েছে। 'ক'টা বাজে রে?'

'দশটা বেজে গেছে।'

'সেকি রে?'

'তবে কি? ওঠ। মাসিমা তোকে ডাকছেন।'

'কোথায় মাসিমা?'

'রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে গল্প করছেন।'

মাসিমার কথা শুনে আর শুয়ে থাকলাম না। উঠে পড়লাম। চোখেমুখে জল দিয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মাসিমা, আমায় ডাকছেন?

'হ্যাঁরে।'

'কেন?'

'বলছিলাম তুই একটু আসানসোল যেতে পারিস?'

আসানসোল শুনেই গত বছরের দিনগুলোর কথা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে পড়ল সব কথা। সব কিছু। 'কেন মাসিমা?'

'খুকি তো অনেক দিন আসে না, তাই আমি জামাইকে লিখেছিলাম ওকে কিছুদিনের জন্যে দিয়ে যেতে...'

'জামাইবাবু রাজী হয়েছেন?'

'জামাই আসবে বলে কথা ছিল কিন্তু এইমাত্র সকালের ডাকে চিঠি পেলাম যে কি একটা মিটিং-এর জন্য ওকে দিল্লি যেতে হচ্ছে। তাই তোর কথা লিখেছে...।'

'আমার কথা কি লিখেছেন?'

'লিখেছে, তোকে গিয়ে নিয়ে আসতে। তুই গেলে কি পড়াশোনার খুব ক্ষতি হবে?'

মা বললেন, 'কলেজ তো বন্ধ। দুদিনের জন্য আসানসোল গেলে কি আর ক্ষতি হবে?'

আমি পরের দিন আসানসোল গেলাম। রিকশাওয়ালাকে অনেক খেসারত

দিয়ে শেষ পর্যন্ত কালনা যাবার রাস্তায় ওদের বাড়িতে পৌঁছলাম। জামাইবাবুও বাড়ি ছিলেন। আমাকে দেখে ভীষণ খুশি হলেন। 'এসো, এসো, শালাবাবু এসো।'

স্মৃতিদি হলুদের হাত আঁচলে মুছতে মুছতে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। 'চিনে আসতে পারলি?'

'জিজ্ঞাসা করতে করতে চলে এলাম।'

জামাইবাবু জানতে চাইলেন, 'খুব বেশি ঘুরতে হয়েছে?'

'না, না।'

'তুমি না এলে অফিসের একটি ছেলেকে দিয়ে তোমার দিদিকে পাঠাতাম।'

'আপনি কবে দিল্লি যাচ্ছেন?'

'আজ।'

'আজ?'

'হ্যাঁ, আজই কালকা মেলে।'

'কোনো মিটিং আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া লেবার মিনিস্ট্রিতেও কিছু কাজ আছে।'

'কবে ফিরবেন?'

'দশ-বারো দিনের আগে তো নয়।'

খুব গল্প হলো। আমার বেশ লাগল। ইউনিয়ন নিয়ে একটু বেশি মেতে থাকলেও বেশ দিলখোলা লোক। উনি যাবেন বলে একটু তাড়াতাড়িই খেতে বসলাম। খেতে খেতেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে কলকাতায় যাবে?'

'কাল সকালেই কোনো ট্রেনে চলে যাব।'

'কালই কেন? দু-একদিন পরে যেও।'

'আপনি চলে যাচ্ছেন...'

'তাতে কী হলো? কলেজ তো বন্ধ।'

'হ্যাঁ।'

'তাই বলে কালই যেও না। বরং পরশু যেও।' এবার স্মৃতিদির দিকে ফিরে বললেন, শালাবাবুকে একটু যত্ন করো। পরশুরাম এলে ওকে দিয়ে বাজার করিয়ে নিও।'

ন টা বাজতে না বাজতেই উনি চলে গেলেন। স্টেশনে যাবার পথে আরো দু-তিনজনকে তুলে নিতে হবে বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। আমি স্টেশনে যেতে চেয়েছিলাম উনি বারণ করলেন, এত রাত্রে স্টেশনে গিয়ে

কী করবে? একটু গল্পগুজব করে শুয়ে পড়।

দুখানা ঘরের ছোট কোয়ার্টার। বেশ ছিমছাম। বাইরের ঘরে একটা তক্তপোষ আর দুখানা বেতের চেয়ার। তক্তপোষের উপর একটা পরিষ্কার শতরঞ্চি পাতা! শেলফ্-এ কিছু বই। কিছু উপন্যাস, কিছু রাজনৈতিক ভিতরের ঘরে শোয়। বড় একটা খাট। দু-চারটে ট্রাঙ্ক-সুটকেশ। এক কোণায় একটা রেডিও। রেডিও-র উপরে একটা ছোট্ট পুতুল। বারান্দায় খাবার টেবিলের পাশে একটা মানি প্ল্যান্ট।

সব ঘুরে ফিরে দেখে শুনে বললাম, 'বেশ সুখেই আছ।'

'খুব সুখে আছি।'

'আর কি সুখে থাকবে?'

'তুই যদি মেয়ে হতিস তাহলে বুঝতে পারতিস!'

আমি একটু ঠাট্টা করে বললাম, 'কেন? উনি তো তোমাকে খুব ভালোবাসেন।'

'কর্তব্য করা আর ভালোবাসা এক না।'

'ভালো না বাসলে কেউ কর্তব্য করে?'

'কেউ কেউ করে।'

স্বামী রাজনীতি নিয়ে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছে যে স্মৃতিদি তার ন্যায্য পাওনাটুকু পায় না। মনের মধ্যে অভিমান, আক্ষেপ, হতাশা জমে উঠেছে। আমি সান্ত্বনা জানিয়ে বললাম, 'কিছুকাল পরেই ওসব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব কিছুরই একটা বয়স আছে, সময় আছে।'

'সে সময় তো কারুর আগে, কারুর পরে আসে।'

'ওর কোনদিনই আসবে না।'

'এসে গেছে অথচ আসবে না বলছ?'

'তুই তো ওকে খুব চিনেছিস।'

'যাবার আগে দরজার আড়ালে...'

স্মৃতিদি ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলল, 'অসভ্য কোথাকার।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ধরে বললাম, 'এর আগে সভ্য ছিলাম?'

'ছিলিই তো।'

'লাইটহাউসে সিনেমা দেখার পরও সভ্য ছিলাম?'

স্মৃতিদি হাতটা ছাড়িয়ে আমার মুখে চেপে ধরে বলল, 'চুপ কর।'

আমি বাঁ হাত দিয়ে ওর হাতটা সরিয়ে বললাম, 'চুপ করলেই সব ইতিহাস চাপা পড়বে?'

হঠাৎ দরজায় কে ধাক্কা দিল। স্মৃতিদি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি পটলের মা।'

স্মৃতিদি দরজা খুলতেই পটলের মা বলল, 'ভাই এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি বাড়ি যাই?'

'যাও।'

পটলের মা পটলের হাত ধরে চলে গেল।

স্মৃতিদি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এগিয়ে আসতেই বললাম, 'ওকে ফিরিয়ে দেওয়া কি ঠিক হলো?'

'কেন?'

মুচকি হেসে বললাম, 'আমার মতো ভালো ছেলেকে নিয়ে থাকতে ভয় করবে না?'

'তুই এবার একটা থাপ্পড় খাবি।'

'তোমার থাপ্পড় খাবার জন্যই তো এলাম।'

কথায় কথায় বেশ রাত হয়েছিল। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। মনে হচ্ছে আরো অনেক রাত হয়েছে। চারপাশ নিঝুম নিস্তব্ধ। কোয়ার্টারগুলো ছাড়া ছাড়া। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। মিট মিট করে রাস্তায় আলো জ্বলছে কিন্তু কোয়ার্টারগুলো অন্ধকার।

'কোয়ার্টারগুলো অন্ধকার কেন?'

'এখানে সবাই দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে।'

'তুমিও?'

'ও সকাল সকাল ফিরলে দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ি।'

'আমি এসে তোমার অভ্যাস নষ্ট করছি?'

'চুপ কর। বাজে বকিস না।'

স্মৃতিদি খাবার পর রান্নাঘরে, বাইরের দরজায় তালা দিল। আমি বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে বইপত্তর দেখছিলাম। স্মৃতিদি এসে ডাক দিল, 'চল ওই ঘরে চল।'

'ওই ঘরে কেন?'

'কেন আবার? গল্প করব।'

'তার চাইতে এইখানেই বসে গল্প কর।'

'ওই ঘরে গল্প করলে কি হয়েছে?'

'এখানে গল্প করতে করতে ঘুম পেলে শুয়ে পড়তে পারব।'

'আচ্ছা, এখানে আমি তোর বিছানা ঠিক করে রাখছি। ঘুম পেলেই চলে আসিস।'

শেষ পর্যন্ত ওদের শোবার ঘরেই গেলাম। আমি পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে হেলান দিলাম। স্মৃতিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই শাড়ি ব্লাউজ পাল্টে এলো। আমি অবাক হলাম। 'একি? এখন কাপড়-চোপড় পাল্টালে?'

'আমি পরিষ্কার কাপড় না পরে শুতে পারি না। তুই জানিস না?'

'তুমি শুতে যাবার আগে পরে কি কর তা আমি জানব কেমন করে?'

'বেণু?'

'কী?'

'তুই তো আজকাল বেশ কথা বলিস।'

এবার স্মৃতিদি আমার দিকে পিছন ফিরে একটু পাউডার মাখল।

এক বছর আগে স্মৃতিদিকে কাছে পেয়েছিলাম, উপভোগ করেছিলাম। এই এক বছর ধরে সেই স্মৃতির জ্বালা ভোগ করেছি। মাঝে মাঝে দুঃখ হয়েছে, কষ্ট হয়েছে। অনুতাপও হয়েছে। সব কিছু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। কাউকে জানতে দিইনি, বুঝতে দিইনি। ট্রেনে আসতে আসতে অনেক কথা ভেবেছি। ভেবেছি ওকে একলা পেলেই জড়িয়ে ধরব, কাছে টেনে নেব, আদর করব। পুরনো দিনের মতো আনন্দমেলা খুলব। পারিনি। এতক্ষণে পারিনি। লোভ হলেও সামলে রেখেছি। হাজার হোক ও বিবাহিতা। ওর স্বামী আমাকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে রেখে গেছেন। তার বিশ্বাসের অবমাননা করা অন্যায়। পাপ। বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু আর পারলাম না। স্মৃতিদিকে পাউডার মাখতে দেখে আর পারলাম না। বিছানা থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ভালো করে পাউডার মাখিয়ে দেব?'

স্মৃতিদি সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আলো জ্বলছে, জানালা খোলা রয়েছে, এমন করে জড়িয়ে ধরে?'

আমি তাড়াতাড়ি আলোর সুইচ অফ্ করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। টানতে টানতে বিছানায় নিয়ে এসেই পাগলের মতো আদর করতে আরম্ভ করলাম। কয়েক মিনিট। তারপর ও আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে

দিতে বলল, 'বেণু, পাগলামি না করে শুধু আমাকে একটু ভালো করে বুকের মধ্যে চেপে রাখতো।'

'শুধু বুকের মধ্যে চেপে রাখব?'

'হ্যাঁ।'

'কেন কি হল?'

'কোনোদিন তো ও আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করে না, তাই...'

কথাটা শেষ করতে পারল না। গলাটা ভেজা ভেজা হয়ে উঠল।

হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়ায় আমার পাগলামি খানিকটা কমে গেল।

'শুধু বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখলেই তুমি খুশি?'

'আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

'তোমাকে উনি আদর করেন না?'

'খুব কম।'

'কেন?'

'ঠিক বুঝতে পারি না।'

'তবুও কি মনে হয়?'

'ঠিক এখুনি বিয়ে করতে ও চায়নি। তাছাড়া হয়তো পলিটিক্স করে এমন মেয়েকেই ও বিয়ে করতে চেয়েছিল...'

আরো একটু ভালো করে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'তুমি কি করে জানলে?'

'ও তো কিছু বলে না। এ সবই আমার ধারণা।'

একটু চুপ করে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যেই ওকে একবার ভালো করে দেখলাম। 'উনি যদি আর কাউকে বিয়ে করতে চাইতেন তাহলে তোমাকে এত যত্নে রাখতেন না।'

'জানিস বেণু, ওর মতো ভালো ছেলে আজকের দিনে দুর্লভ। কর্তব্যে ত্রুটি করবে না কোনোদিন। ইউনিয়নের সেক্রেটারি হয়েও অফিসে কি অস্বাভাবিক পরিশ্রম করে তা তুই কল্পনা করতে পারবি না...'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আগেকার সেক্রেটারিরা একদিনও অফিস করত না। অফিসের পর ইউনিয়নের কাজ করে বলেই তো রোজ এত রাত্তিরে বাড়ি আসে।'

কি বিচিত্র মেয়ে এই স্মৃতিদি! বিবাহিতা হয়েও অপর যুবকের বুকের মধ্যে শুয়ে আছে অথচ স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ! একই আকাশের একদিকে সূর্য

ওঠে, আরেক দিক দিয়ে অস্ত যায়। কি বিচিত্র এই প্রকৃতি! ভাবলেও অবাক লাগে! স্বামীর গর্বে গরবিনী স্ত্রী ভালোবাসার কাঙাল হয়ে পর পুরুষের কাছে ছুটে আসছে?'

স্মৃতিদিকে ঠিক আগের মতো জোর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে পারলাম না। একটু শিথিল হয়ে এল আমার হাতের বন্ধন। কামাতুর, লোভী, লম্পট আমি তলিয়ে যেতে চাই। তলিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছি অথচ পারছি না। ইচ্ছা আছে কিন্তু প্রবৃত্তি হচ্ছে না। আমি স্বাস্থ্যবান হয়েও হাতে যেন শক্তি পাচ্ছে না। অবশ হয়ে আসছে হাত দুটো।

'কি রে বেণু? চুপ করে আছিস কেন?'

'এমনি।'

'কথা বলবি না?'

'একটু পরে।'

'কেন?'

'তোমার কথাগুলো ভাবছি।'

'ভাবার মতো কি বললাম?'

জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে স্মৃতিদি আমার মুখ ধরে নাড়া দিয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়লি?'

ঘুম? ঘুমুতে পারলে তো বেঁচে যেতাম। অনেক জ্বালা, দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পেতাম কিন্তু ঘুম আসছে কোথায়? যারা ঘুমুতে পারলে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা-বেদনা ভুলতে পারে, ঠিক তাদেরই পোড়া চোখে ঘুম আসে না। যারা শোকে-দুঃখে নিত্য জর্জরিত তারা সারা রাত পাগলের মতো ছটফট করে, আর যারা সুখী যাদের কোনো অভিযোগ নেই, আক্ষেপ নেই, যারা হাসতে হাসতে রাতের পর রাত জাগতে পারে, তারা মহাশান্তিতে ঘুমুতে পারে। ঘুমোয়। আমি যদি ঘুমুতে পারতাম, তাহলে...

'কিরে কথা বলছিস না কেন?' স্মৃতিদি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল।

'তোমার ঘুম পায়নি?'

'না।'

'কেন?'

'আজ তোকে কাছে পেয়েও ঘুমুব?'

'আমাকে কাছে পেয়েছ তো কি হয়েছে?'

'গতবার কি আনন্দ করেছি বল তো?'

'তোমার সেকথা মনে আছে?'

'কেন? তুই বুঝি ভুলে গিয়েছিস?'

'সেই কথা ভুলি নি বলেই তো এলাম।'

'আমি জানতাম তুই আসবি।'

'আর কি জানতে?'

'জানতাম তুই এলে খুব মজা হবে।'

'মজা হবে মানে?'

আমার গাল টিপে স্মৃতিদি বলল, 'ন্যাকামী করছিস?'

'সত্যি বল না কি মজা হবে ভেবেছিলে।'

'তোর সঙ্গে যেমন প্রাণ খুলে আনন্দ করেছি এমন আনন্দ তো পাই না তাই তো ভেবেছি তুই এলে খুব মজা করব, আনন্দ করব।'

আমি আস্তে আস্তে আবার হাতে জোর ফিরে পাচ্ছি। অনুভব করছি রক্তের চাপ বাড়ছে।

'সত্যি বলছ স্মৃতিদি?'

'তোকে ছুঁয়ে বলছি।'

স্মৃতিদি নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে। বুকটা উঠছে, নামছে। আমার বুকের মধ্যে তা অনুভব করছি। ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগছে। এখন নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে ওকে বুকের মধ্যে পেয়ে আমার আবার পাগল হতে ইচ্ছে করছে। তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না। কেন সামলাব? কি প্রয়োজন?

আমি বেশ বুঝতে পারছি স্মৃতিদির মধ্যেও ঝড় উঠছে। উঠেছে। যেন সমুদ্রে তুফান। আমার ছোট্ট ডিঙি নৌকো, আর সামলাতে পারছি না। ইচ্ছাও করছে না। শক্তিও নেই। টলমল করছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডুবতে শুরু করেছি। ডুবছি। ডুবলাম।

আমি আবার তলিয়ে গেলাম!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিতৃষ্ণার সাধ পেলাম। নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা। আমার প্রবৃত্তির প্রতি, চরিত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা লাগল। দুঃখ হতাশা, অভাব-অনটনের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে চুরি করে ঢুকছি। উপভোগ করছি। যা আমার নয়, যা আমার হতে পারে না, আমি তাই স্বচ্ছন্দে ভোগ করছি। উপভোগ করছি। আমি কি মানুষ? আমার কি কোনো বোধ-শক্তি নেই? কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমি কি ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, সাদা-কালো,

দিন-রাত্তিরের পার্থক্যও বুঝতে পারি না?

আমি একটা পশু। জানোয়ার।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে এসেছিল স্মৃতিদি। অনেক কিছু পেয়েছে, অনেক কিছু পায়নি। স্বামীর সোহাগ, ভালোবাসা হয়তো মন ভরে পায়নি। লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়ে হয়তো আমার একটু স্পর্শ ওর ভালো লেগেছিল, নতুন অনুভূতির ঢেউ এসেছিল ওর মনে, পল্লবিত যৌবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। ও প্রতিবাদ করতে পারেনি, বাধা দিতে পারেনি। আমার ভালো লেগেছে। ওর নীরবতা আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমার নেশা আরো বেড়েছে। আমি পাগল হয়েছি। পশুর মতো ক্ষেপেছি। সর্বনাশা পদ্মার মতো ওর সব বাঁধন ভেঙেছি। ওর সংস্কার ভাসিয়ে নিয়েছি। দিয়েছি। কিন্তু আবার কেন? ছেলেবেলায় এই স্মৃতিদি আমার জন্য কত কি করেছে। আদর করেছে, ভালোবেসেছে, খেলা করেছে, খাইয়েছে। তার বিনিময়ে কি...

'স্মৃতিদি, পাখাটা একটু জোর করে দেবে?'

'কেন? গরম লাগছে?' ও আমার কপালে, মুখে ও গলায় হাত দিয়ে বলল, একি রে! তুই তো বেশ ঘামছিস।

ও উঠে পাখাটা জোর করে দিল। আবার আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিল।

'আচ্ছা স্মৃতিদি, একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কেন বলব না?'

'আমার মতো খারাপ ছেলেকে তোমার ঘেন্না...'

ও আমার মুখ চেপে ধরে বলল, 'চুপ কর।'

'না, না, স্মৃতিদি, আমি সত্যি বড় খারাপ।'

'আমি কি তোকে খারাপ বলেছি?'

আমি চুপ করে আছি। স্মৃতিদি আবার বলল, 'তুই খারাপ হবি কেন? আমিই তো তোকে খারাপ করেছি।'

আমি তবু চুপ করে আছি।

'জানিস বেণু, সব মেয়ের মনেই কিছু স্বপ্ন, কিছু আশা থাকে, স্বামীর ঘর করা সম্পর্কে। আমারও ছিল। ভেবেছিলাম স্বামী আমাকে আদর করবে, ভালোবাসবে, আনন্দ করবে, আমাকে নিয়ে একটু পাগলামি করবে!'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একটু থামল।

একটু ভেজা গলায় আবার শুরু করল, 'স্বামীর কাছে যা চেয়েছিলাম তা

পেলাম না, বাকি সবকিছু পেলাম।'

'যৌবনের নিজস্ব গর্ব আছে, অহঙ্কার আছে। সে গর্ব, সে অহঙ্কার আহত হলে দুঃখ হয়। পরিণতি সব সময় শুভ নয় কিন্তু...'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, 'কিন্তু তোমার উপর আমার কি অধিকার?'

'অত-শত আমি বুঝি না, জানি না।'

আমি হাসলাম। স্মৃতিদি কত সহজ, কত সরল!

'তোমার এই সারল্যের সুযোগ নিয়েই তো আমি তোমার সর্বনাশ করছি।'

স্মৃতিদি উপুড় হয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে হাত দিতে দিতে বলল, 'তুই এত ভাবছিস কেন রে?'

'দিনে দিনে আমি এত খারাপ হচ্ছি যে মাঝে মাঝে বড় ভয় হয়, ভাবনা হয়।'

'না, না, এত ভাবিস না। এবার ঘুমো। আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

অনেক পরে, অনেক রাতে সত্যি ঘুমিয়ে পড়লাম কিন্তু ভোরের দিকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগায় ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে ফুল স্পীডে ফ্যান ঘুরছে। ঠাণ্ডা তো লাগবেই। স্মৃতিদিরও নিশ্চয় শীত করছে। জড়সড় হয়ে আমাকে জড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে। মহা শান্তিতে, মহা আরামে ঘুমুচ্ছে। একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কোনো মালিন্য দেখলাম না। কোনো দুশ্চিন্তার কালিমা দেখলাম না। কেমন যেন অসহায় হয়ে আমার কাছে, আমার বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে।

কিন্তু কেন?

খুব আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে উঠলাম। ফ্যানের সুইচ অফ্ করলাম। জানালার কাছে যেতেই দেখলাম বৃষ্টির জল ঘরে আসছে। সুটকেশের উপরটা ভিজে গেছে। জানালাটা বন্ধ করলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে কোনো চাদর পেলাম না। শেষে বিছানার চাদরটাই উল্টে স্মৃতিদির গায়ে দিলাম।

ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখলাম, স্মৃতিদিকে দেখলাম। ভালো লাগল। মায়া হলো। ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও বেরুতে পারলাম না। ফিরলাম। ওর কাছে, ওর পাশে ফিরে গেলাম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। মুখের দিকে, শরীরের দিকে। আরো একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। দুটো আঙুল দিয়ে ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য। আমার তো লোভ হচ্ছে না? আমি তো নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছি না?

একবার ওকে আদর করলাম। না করে পারলাম না। আস্তে আস্তে ওর পাশে

কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা নিজেই টের পাইনি। ঘুম ভাঙল স্মৃতিদির ডাকে, 'এই বেণু। ওঠ। অনেক বেলা হলো।'

ঘুম ভেঙে দেখি আমার গায়ে একটা বেড কভার। স্মৃতিদি ওঠার পর আমার গায়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন এই ভালোবাসা? কেন এই দুর্বলতা?

'চা খা।'

সারাটা দিন বেশ কাটল। মুষলধারে বৃষ্টি হলো। ঘরের বাইরে যেতে পারলাম না। দরকারও ছিল না। কলকাতা যাওয়াও হলো না।

'আজ আর এত বৃষ্টির মধ্যে যাব না, কি বল?'

বুঝলাম ওর ইচ্ছা নেই। 'ঠিক আছে।'

'তোর কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

'আমার ক্ষতি? বরং তোমারই ক্ষতি হতে পারে।'

'আবার ওই রকম কথাবার্তা বলছিস?'

'বলব না?'

'না।'

বলিনি। সারাদিন, সারা সন্ধ্যা বলিনি।

সন্ধ্যার পর প্রকাশবাবু এসে স্মৃতিদির খবর নিয়ে গেলেন। 'আজ এই বৃষ্টির মধ্যে না যেয়ে ভালোই করেছেন।' স্মৃতিদি চলে গেলে ওঁর কাছেই বাড়ির চাবি থাকবে। উনিই বাড়ির দেখাশুনা করবেন। উনি চলে যাবার পর আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম।

শোবার আগে স্মৃতিদি আবার কাপড়-চোপড় পাল্টে নিল। পাউডার মাখল। কিন্তু আমি আর ঝাঁপিয়ে পড়লাম না। পারলাম না। লোভ যে হয়নি, তা নয়। তবে অনেক কষ্টে সম্বরণ করলাম।

'স্মৃতিদি, আজ তোমাকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

'কেন রে?'

'আমার খুব ইচ্ছা করছে।'

ও আর আপত্তি করেনি। আমি সত্যি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওর স্বপ্নমাখা মুখখানা দেখতে দেখতে ঘুমিয়েছিলাম।

সাত

লোকে আমাকে যাই ভাবুক না কেন, আমি আস্তে আস্তে নিজেকে চিনতে শুরু করলাম। নিজেকে ঘেন্না করতে শুরু করলাম। সব চাইতে আগে বুঝেছিল স্মৃতিদি। কলকাতা ছাড়ার দু-একদিন আগে আমাকে বলেছিল, 'তুই কেমন পাল্টে গেছিস।'

আমি শুধু হাসলাম।

'হাসছিস কেন? সত্যি তুই দারুণ পাল্টে গেছিস।'

এবারও কিছু বললাম না। মাথা নিচু করে শুনলাম। স্মৃতিদিও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত দিতে দিতে বলল, 'আমাকে ভুলে যাবি না তো বেণু?'

আমি জানি ওরা কত দুঃখ-কষ্টে মানুষ হয়েছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করেছে। শিশিরদা-বাদলদার মতো নোংরা মানুষের কৃপায় ওরা বেঁচে থাকুক, আমি তা চাই না। চাইতে পারি না। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে স্মৃতিদি সুখী হলে আমার ভালো লাগত। ভালো লাগবে। কক্ষচ্যুত গ্রহের যেমন নির্দিষ্ট কোনো পথ থাকে না, আশাহত, মর্মাহত মানুষও ঠিক স্বাভাবিক পথে এগুতে পারে না। স্মৃতিদি তাই একটু ছিটকে পড়েছিল। আমি ওকে বিপথে এনেছিলাম কিন্তু আর না। কখনই না।

দুটো হাত দিয়ে ওর দুটো হাত চেপে ধরে বললাম, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো স্মৃতিদি। আমার দ্বারা আর কোনোদিন তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।'

আর বলতে পারলাম না। গলা দিয়ে বেরুল না। একটা কথাও বেরুল না। ও নিজেও বিশেষ কিছু বলতে পারল না, 'দূর পাগল! তুই আমার ক্ষতি করবি কেন?'

স্মৃতিদি একটা বিচিত্র মেয়ে। এই পৃথিবীতে কারুর কাছে ওর কোনো দাবী নেই। মনে মনে আশা আছে, স্বপ্ন আছে কিন্তু তার প্রকাশ করার সাহস, ক্ষমতা নেই। কেউ অন্যায় করলে প্রতিবাদ করে না, কেউ কিছু দাবী করলে ফিরিয়ে দিতে পারে না। কোনোদিন না। বিয়ের আগেও না পরেও না। স্বামীর কাছে

যেমন দাবী করতে পারেনি তেমনি আমার দাবীকেও ফিরিয়ে দিতে পারেনি। আশ্চর্য! গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া যায় কিন্তু তাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে সবাই পারে না। আমিও পারি না। পারলাম না।

স্মৃতিদি চলে গেল।

চলে গেল আরো কত দিন। ঘটে গেল আরো কত কি! শেষে একদিন গীতিও চলে গেল। সামান্য মাইনের নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি নিয়ে বাঁকুড়া চলে গেল। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে আসত। সারা মাসের ছুটি জমিয়ে আসত। টাকা দিয়ে যেত।

কয়েক মাস পরে খেয়াল হলো গীতিও পাল্টে গেছে। একটু সিরিয়াস হয়েছে, গম্ভীর হয়েছে। আমার কাছে আসত, বসত, গল্প করত কিন্তু আগের মতো আর এগুতো না। আমিও কিছু বলতাম না।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'চাকরি কেমন লাগছে?'

হাসল। 'শিশিরদা-বাদলদার খামখেয়ালিপনার মদত জোগাবার চাইতে ভালো।'

'তোকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'দেখে আবার কি মনে হবে?'

'চেহারা দেখলেই মানুষের অবস্থা বোঝা যায়। এখন তোকে দেখলেই মনে হয় আগের চাইতে সুখী।'

ও একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সুখ! এ জীবনে আর হলো না।'

'কেন? এইতো তোর জীবন শুরু হলো।'

'শুরু না ঘোড়ার ডিম।'

চাকরিটা যে বিশেষ সুবিধার নয়, তা জানতাম। বুঝতাম। এমন চাকরি নিয়ে বাইরে যাওয়াতে মাসিমার একটুও মত ছিল না। তারপর মেয়ে বড় হয়েছে। চিন্তার শেষ নেই। তবু কিছু বলেননি। বলতে পারেননি। সংসারের অবস্থা চিন্তা করে মেনে নিয়েছেন। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। গীতি বাইরে থাকায় সংসারের কিছু খরচ কমেছে। তারপর মাসে মাসে সত্তর-আশি টাকা সংসারে আসছে।

বললাম, 'তোর জন্য মাসিমার খুব চিন্তা।'

'কেন?'

'কেন আবার? বড় হয়েছিস। বাইরে একলা একলা থাকলে চিন্তা হবে না?'

'না, হবে না।'

'হবে না, বললেই হবে না, তাই না? যদি কিছু হয়?'

ও এবার হাসল। 'এখানে থাকতে কোনো ভয় ছিল না, তাই না রে?' এবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওখানে কোনো বেণু নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল। দৌড়ে পালাল। আমি দৌড়ে ওকে ধরতে পারতাম কিন্তু ধরলাম না। যাক। ও মুক্ত হোক। মুক্ত থাক। শিশিরদা বলাইদা-বেণুর থেকে ও মুক্ত থাক।

গীতি না থাকায় বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নিজের মধ্যেই কেমন একটা শূন্যতা বোধ করি সব সময়। একলা থাকলে আরো বেশি করে ওর কথা মনে পড়ে। ভালো লাগে না। ছটফট করি। অস্বস্তি বোধ করি। পরীক্ষা এসে গেছে অথচ পড়াশোনায় মন বসে না। অনার্স নিয়ে পাস না করলে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না। সবাই আমাকে খারাপ ভাববে। তা হতে পারে না কিন্তু—

সন্ধ্যার পর পড়তে বসেই চমকে উঠলাম! চিঠি? বীথির চিঠি? আশ্চর্য! ও বড় হয়েছে, এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে, জানি কিন্তু...

আমাকে চিঠি লিখেছে? আমি তো কোনোদিন...। ও নিজেও তো কোনোদিন কিছু ইঙ্গিত দেয়নি। তবু চিঠি লিখল কেন?

ছেলেবেলা থেকেই স্মৃতিদি আর গীতির সঙ্গেই আমার ভাব, ভালোবাসা। বীথির সঙ্গে সে ভাব, ভালোবাসা হতে পারেনি। প্রয়োজন হয়নি। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই ওকে আমার ঠিক পছন্দ হতো না। ভালো লাগত না। কোনোদিন ঝগড়া-মারামারি না করলেও আমাদের দুজনের দূরত্ব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। কথা বলি। হাসি-ঠাট্টা করি। গল্প-গুজব করি কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোনোদিনের জন্য কোনো আকর্ষণ, কোনো মোহ বোধ করিনি। সেই বীথি চিঠি লিখেছে?

অনেকক্ষণ অনেক কিছু ভাবার পর চিঠিটা পড়লাম। বেণুদা, মনে হয় আমাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন বা অবকাশ তোমার হয়নি। কিন্তু আমি তোমার কথা না ভেবে পারি না। কেন ভাবি, তা জানি না তবে নিজের কথা ভাবতে গেলেই তোমার কথা না ভেবে পারি না। তোমাকে দেখতে, তোমার কথা ভাবতে ভালো লাগে। মনে মনে তৃপ্তি পাই। শান্তি পাই। দিদি, মেজদি নেই। কোণার ঘরে আমি একলা একলা থাকি। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে

পড়ার পরও আমি ঘুমুতে পারি না। জেগে থাকি। তোমার কথা ভাবি। ভাবি অনেক কিছু। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। আমার এই স্বপ্ন কি কোনোদিন সত্যি হবে না?

ছোট্ট চিঠি। শেষে লিখেছে, আমি তোমার আদর নিলাম, তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তারপর?

তোমার বীথি।

চমকে উঠলাম চিঠিটা পড়ে। চিঠিটা ছোট্ট হলেও অনেক কথায় ভরা। কি যেন এক নিমন্ত্রণের আমন্ত্রণ। মনে মনে একটু উত্তেজিত না হয়ে পারলাম না। চিঠিটা বহুবার পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে। না পড়ে পারলাম না। যত বেশি পড়লাম তত বেশি অবাক হলাম। শেষে বীথিও?

অবাক হয়ে ভাবলাম। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম। না, না, অবাক হবার কি আছে? বীথি বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। দেহে বিপ্লব এসেছে, মনে স্বপ্ন আসবে না? এই বয়সে স্বপ্ন দেখাই তো স্বাভাবিক। মাটির পৃথিবীতে বাস করেও মনে মনে দূরের আকাশে বিচরণ করার এই তো বয়স। কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি? পারব কেমন করে? বহুজনের মধ্যে থেকেও নিজে স্বতন্ত্র থাকার এই তো বয়স। সময়। এই বয়সে মানুষ একান্ত নিজস্ব দুনিয়ায় বিচরণ করে। সে রাজ্যে আশে-পাশের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। ব্যতিক্রম শুধু একজন! মনের মানুষের। প্রাণের মানুষের। ও আমাকে এই রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে?

বীথিকে রোজ দেখি। ও বাড়িতে, এ বাড়িতে। পথে-ঘাটে। কখনও পিছনের বাগানে। নালার এপারে, ওপারে। যতদিন জ্ঞান হয়েছে, ততদিন দেখছি। দেখেছি পুতুল খেলতে, দেখেছি চঞ্চলা শিশুরূপে। দেখেছি কিশোরী বীথিকে। তারপরও দেখেছি। ঈষৎ লাজুক। চোখে মুখে একটা নতুন ইসারা। ওর লম্বা বিনুনিটা টেনেছি, ও ভেংচি কেটে পালিয়েছে। অনেক দূরে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখেছে আমি পিছন পিছন আসছি কিনা। শাড়ি পরার পরও দেখেছি। কিন্তু...

কিন্তু কি?

বোধহয় ভালো করে দেখিনি। দেখবার মন নিয়ে দেখিনি। ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করল। নতুন করে দেখতে মন চাইল। পড়তে পারলাম না। উঠে পড়লাম।

'মা, আমি একটু ওবাড়ি থেকে আসছি।'

'টেনু মন্টুর কাছে গেছে। ওকে পাঠিয়ে দিবি।'

'আচ্ছা।'

পিছনের দরজা দিয়ে বেরুলাম। এদিক ওদিককার বাড়ি থেকে একটু-আধটু আলো এলেও বেশ অন্ধকার! এই বাগানের রাস্তা দিয়ে আমরা নিত্য যাতায়াত করি বলে চোখ বেঁধে দিলেও ঠিক যেতে পারব কিন্তু এই অন্ধকারে অন্য কারুর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। এই বাগানটুকু আমার খুব ভালো লাগে। ছেলেবেলায় স্মৃতিদি আর গীতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি। তারপর বনভোজন করেছি। বড় হয়ে। সে কথা বলা যায় না। এই বাগানে এখন যদি বীথির সঙ্গে দেখা হয়?

আপন মনে ভাবতে ভাবতেই নালাটা পার হলাম। কলাগাছগুলো ডান দিকে রাখলাম।

'এই দাদা! কোথায় যাচ্ছিস?'

টেনুর গলা শুনে চমকে উঠলাম। 'তুই একলা একলা এই অন্ধকারে...'

'আমি আছি।'

অ্যাঁ! বীথি! হঠাৎ ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলাম! সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম। টেনুকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি যা। মা তোকে ডাকছেন।'

'তুমি ওবাড়ি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

টেনু পিছন ফিরে বীথিকে বলল, 'এবার তুমি যাও ছোড়দি।'

'পারবি তো যেতে?'

টেনু হাসল। 'না পারার কী আছে?'

টেনু চলে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। ঘুরে দেখি বীথি ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। মিনিট খানেক কেউ কথা বললাম না।

'টেনুকে পৌঁছতে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'রোজ তো পৌঁছে দাও না?'

'আজ ইচ্ছে হলো।'

'আসল কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা করছে?'

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি এখন এখানে?'

'টেনুকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।'

অন্ধকারে ওর মুখ দেখতে পারলাম না কিন্তু ওর চাপা হাসির আওয়াজ পেলাম। অনেকক্ষণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে এবার হেরে গেলাম। ওর মাথায় আস্তে একটা চাঁটি মেরে বললাম, 'বেশ ওস্তাদ হয়েছিস তো!'

'আমার চিঠির জবাব কই?'

'লিখিনি।'

'কেন?'

'ওর কি কোনো জবাব হয়?'

'হয় না?'

'না!'

'কেন?'

'জবাব হয় না বলেই নিজে যাচ্ছিলাম।'

ও প্রায় স্বগতোক্তি করে বলল, 'আমার জবাব চাই।'

আমি আর একটু ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে, সত্যিই তুই আমার কথা এত ভাবিস?'

'কেন? ভাবা কি অন্যায়, নাকি অস্বাভাবিক?'

'তা তো আমি বলিনি।'

ও আর এই বাগানে দাঁড়াতে চাইল না। 'আমাদের বাড়ি যাবে?'

'চল।'

'চলো।'

বীথির জন্য এবাড়িতে এই প্রথম এলাম। কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করলাম। ভালোই লাগল। মনটা অনেক হালকা হলো। মনের শূন্যতা অনেকটা ভরাট হলো। চলে আসার সময় দরজা বন্ধ করতে এসে ও চট করে আমার একটা হাত ধরে খুব জোরে চেপে দিল। মুখে কিছু বলল না।

পরের দিন আবার চিঠি।

বেণুদা, জীবনে বোধহয় এই প্রথম শান্তিতে ঘুমোলাম আর প্রাণভরে স্বপ্ন দেখলাম। বোধহয় কাল সারারাত ধরেই স্বপ্ন দেখেছি। তুমি এসেছ। গল্প করছ। হাসছো, খেলছো, ঘুমোচ্ছো। আমার পাশে, আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুমোচ্ছো। তারপর ঘুম ভেঙে আমাকে দেখলে। হাসলে। আদর করলে। আরো কত কি! তুমি কবে আমাকে আদর করবে, বলতে পার?

চিঠিটা পড়তে ভালোই লাগল। পড়তে পড়তে হাসলাম। তিন বোনের

মধ্যে কত পার্থক্য! কেউ চাঁপা, কেউ চামেলী! কেউ কৃষ্ণচূড়া, কেউ রজনীগন্ধা! স্মৃতিদির কাছে মনটাই বড় কথা। একটু ভালোবাসা, একটু সংবেদনশীল মন পেলেই সে খুশি। গীতির কাছে কর্তব্যের চাইতে বড় কিছু নেই। সংসারের দায়-দায়িত্বের জন্য সে সব কিছু করতে পারে। করেছে। করছে। আর বীথি? নিজের রূপ-যৌবন নিয়েই মত্ত। প্রমত্ত। সর্বনাশা পদ্মা! নিজের স্রোতের টানে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাকেও নিয়ে গেল। পারলাম না নিজেকে ঠেকাতে, বাঁচাতে।

খুব যে ভালো লাগত তা নয়, তবু বীথিকে নিয়ে মেতে উঠলাম। পড়াশুনা নিয়ে সারাটা দিন বেশ কেটে যেত কিন্তু সন্ধ্যার পর একবার ওর সঙ্গে একান্তে দেখা না হলে মন ভরত না।

পরীক্ষার পর মেলামেশা বাড়ল। কি করব? পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কোনোকালেই বিশেষ মেলামেশা করি না! রুচি হয় না। ইচ্ছা করে না। আমি কদাচিৎ কখনও ওদের আড্ডায় হাজির হলে ওরা সবাই কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। ঠিক প্রাণ খুলে কথা হয় না। ওরা বলতে পারে না। আমিও না। আমাদের স্কটিশের কোনো ছেলে এদিকে নেই। শুধু জয়তী ছাড়া। জয়তী রানী-কুঠীতে থাকে। কলেজ যাতায়াতের সময় আমরা দুজনে প্রায়ই একসঙ্গে যাতায়াত করেছি। ভিড়ের বাসে দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। ফাঁকা বাসে দুজনে পাশাপাশি বসেছি বহুদিন। নানা ঋতুতে। বন্ধুত্ব ছিল। ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাছাড়া ও বড় বেশি আত্মসচেতন। নানা কারণে। ওর বাড়ি যাইনি। যাবার প্রয়োজন বা তাগিদবোধ করিনি। শুধু পরীক্ষা শেষ হবার দিন 'দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং'-এর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলেছিল, 'একদিন আমাদের বাড়ি এসো।'

'তুমি কি কলকাতাতেই থাকবে?'

'তবে কোথায় থাকব?'

'কোথাও বেড়াতে যাবে না?'

'গেলেও দেরি আছে।'

'আচ্ছা দেখব।'

যাইনি। বড়লোকের আত্মসচেতন মেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক সহজ হয়ে মিশতে পারি না। পারব না। ওর বাড়ি গিয়ে এক কাপ চা আর দুটো ক্রীম মাখা বিস্কুট খেয়ে কি করব? যাই শুধু মহানির্বাণ রোডে অতীশের বাড়িতে। কয়েকদিন পর পরই যাই। গেলেই ওকে বাড়ি পাওয়া যায়। ওর ওখানে কিছু

সময় বেশ কেটে যায়। সাহিত্য অথবা সিনেমা নিয়ে তর্ক, আলোচনা করতে করতে কেটে যায়। ঝগড়া, তর্ক করার পরও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে– কোনোদিন ঘুগনি কোনোদিন লুচি আর ছোলার ডাল।

এদিকে আমাদের অনেক বন্ধু থাকে। তবে ওদের ওখানে যাই না। অতীশের এখানে আসা-যাওয়ার পথে দু'একদিন উদয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেছে ওদের ডোভার রোডের বাড়িতে। কিন্তু ভালো লাগে না। বড় বেশি লম্বা-চওড়া কথা বলে। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিস?'

ও ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, 'আর বেড়াতে যাওয়া!'

'কেন কী হলো?'

'মেজকাকা বার বার লিখছেন ওয়েলিংটনে যাবার জন্য আর বড় মামা চান পুরো ছুটিটা ওর ওখানে কাটাই...'

'বড়মামা কোথায় থাকেন?'

'বোম্বে। মেজকাকা ওয়েলিংটনে যাবার পর আমরা কেউ যাইনি বলে ভীষণ রেগে আছেন অথচ–'

'তোর মেজকাকা কী করেন?'

'হি ইজ এ কর্নেল। এখন স্টাফ কলেজে গিয়েছেন।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, 'যেখানে হোক একবার ঘুরে আয়।'

'বাবার একটুও মত নেই।'

'কেন?'

'বাইরে যাবার প্রিপারেশন শুরু করতে।'

উদয় ব্যারিস্টারি পড়বে, একথা বহুদিন ধরে শুনছি। আর ভালো লাগে না। আমি স্কটিশে পড়লেও অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। চার আর ছ' নম্বর রুটের বাসের চিন্তায় আমরা এত মশগুল থাকি যে পি য়্যান্ড ও লাইনের সেলিং ডেট নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা ভাবতে পারি না। ভাবি না। ভালো লাগে না। প্রয়োজনবোধ করি না। তাইতো উদয়ের ওখানে গিয়ে ঠিক স্বস্তিবোধ করি না। ভালো লাগে না।

কিন্তু যখন একলা একলা নিজের ঘরে শুয়ে থাকি, আপন মনে ভাবি, বিচার করি, তখন মনে হয় উদয় আমার চাইতে অনেক ভালো। অনেক উঁচু স্তরের ছেলে। একটু বেশি কথা বলে, বড় বড় কথা বলে, চালিয়াতি করে ঠিকই কিন্তু আমার মতো গুড বয় সেজে লুকিয়ে লুকিয়ে নোংরামি তো করে

না! ওদের কাছে আমি ভালো। সবার কাছে আমি ভালো। এমন কি স্মৃতিদি, গীতি, বীথির কাছেও আমি ভালো ছেলে। আমি একদিন বীথিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে তোর ভালো লাগল কেন?'

'তুমি জান না?

'তোর কেন ভালো লাগল, তা আমি জানব কেমন করে?'

'তোমার মতো ভালো ছেলেকে কার না ভালো লাগবে?'

'তার মানে?'

বলতে চায়নি। লজ্জা করেছে। আমি জোর করেছি। বলেছি মিহি সুরে ফিল্মের নায়কের মতো বলেছি, আমার কাছেও তোমার লজ্জা? আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে চিনব না? জানব না?

এবার জবাব পেয়েছি। 'তোমাকে দেখতে ভালো, তুমি পড়াশুনায় ভালো, আদর্শবান, তোমাকে ভালো লাগবে না?'

'তুমি জান আমি আদর্শবান?'

'নিশ্চয়ই জানি।'

'কি করে জানলে?'

'কোনোদিন তো আদর্শচ্যুত হতে দেখিনি, শুনিনি।'

'কার কাছে শোনোনি?'

'কারুর কাছেই শুনিনি।'

'কারুর কাছেই মানে?'

'মা-বাবা, দিদি-মেজদি বা অন্য কারুর কাছেই কিছু শুনিনি।'

ইচ্ছা করল স্মৃতিদি আর গীতির মতামত জানতে কিন্তু লজ্জায় পারলাম না।

'বাবা-মা কী বলেন?'

'বাবা-মার কথা ছেড়ে দাও। মেজদির মতো বিশ্বনিন্দুকও তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'গীতি বিশ্বনিন্দুক নাকি?'

'তবে কি? ও কোনো পুরুষকেই দেখতে পারে না!'

'ও আমার প্রশংসা করে কেন?'

বীথি সরাসরি আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'ওর কথা শুনলে তুমি হাসবে।

'কেন?'

ও হাসতে হাসতে বলল, 'মেজদি বাঁকুড়া থেকে এসেছে। বিকেল বেলায় তোমাদের উঠোনে বসে আমরা সবাই কথাবার্তা বলছি। কথায় কথায় মা আর মাসিমা মেজদির বিয়ের কথা শুরু করলেন। মেজদি সঙ্গে সঙ্গে কী বলল জান?'

'কি?'

'বলল, কাকে বিয়ে করব? সব পুরুষগুলোই তো বদ। স্বার্থপর। বেণু যদি একটু বড় হতো তাহলে ওকেই বিয়ে করতাম।'

আমি তো ওর কথা শুনে অবাক। 'গীতি এই কথা বলল?'

'তবে কি?'

'মা আর মাসিমার সামনে?'

'তবে বললাম কি?'

'মা বা মাসিমা কিছু বললেন না?'

'বলবেন কি? হাসলেন।'

এবার বীথির পালা। 'এবার বল আমাকে কেন ভালো লাগে?'

'তুই সত্যি একটা গ্লামার গার্ল! তোকে ভালো লাগবে না?'

শুনে ও খুশি হলো। হয়তো একটু বাড়িয়ে বললাম, তবু কথাটা ঠিক। ওর একটা নিজস্ব মোহ আছে। অনেকটা ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের মতো। ফ্যাশান প্যারেডের মেয়েদের মতো। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ওর মনের মধ্যে, দেহের মধ্যে, উপভোগের লাভা টগবগ করে ফুটছে। উপভোগের মহাসমুদ্রে ও যৌবনের ময়ূরপঙ্খী নিয়ে ঘুরতে চায়।

'আচ্ছা বেণুদা, এই পৃথিবীতে কি মরতে এসেছি?'

আমি চুপ করে থাকি।

ও আবার বলে, 'আমরা কি বেঁচে আছি? একে কি বাঁচা বলে?' শিশিরদা-বাদলদার মতো জানোয়ারের কাছে মেজদিকে পাঠিয়ে টাকা ধার করে বাঁচাকে কি বাঁচা বলে? মেজদি কি পুরুষদের এমনি ঘেন্না করে?'

ঠিক বলছে কিন্তু মুখে বললাম না। বলার প্রয়োজন হলো না।

'তুমি দেখে নিও বেণুদা, আমি ওদের কিভাবে জব্দ করি।'

প্রতিহিংসার আগুন ওর মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

'মেজদি কিছু বলে না কিন্তু আমি কি কিছু বুঝি না? সব বুঝি, সব জানি। মা মনে করেন ওদের মতো পরোপকারী হয় না। দিদি কিছু অনুমান করলেও ঠিক ভাবতে পারত না, মানুষ এত খারাপ হতে পারে। ও নিজে যে ভালো

তাইতো কাউকে খারাপ ভাবতে পারে না।'

ওর কথাবার্তা শুনে ভালো লাগল। ওর দেহের মধ্যে যে আগুন আছে তা জানতাম কিন্তু মনের মধ্যে এমন প্রতিহিংসার আগুন, এমন প্রতিজ্ঞা চাপা পড়ে আছে, তা জানতাম না। জেনে ভালো লাগল। খুব ভালো লাগল। ভালো লাগার আড়ালে একটু ভয় পেলাম মনের মধ্যে। কোনোদিন আমার বিরুদ্ধে বীথি এমন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠবে না তো?

বীথিও আমার চাইতে মহৎ। ওর জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, আদর্শ আছে। ওর একটা চরিত্র আছে, বলিষ্ঠতা আছে। আমার? আমার কি আছে?

ও আমার হাত দুটো নিয়ে গালের পাশে চেপে ধরে বলল, 'বেণুদা, আমাকে তুমি দেখবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'কোনোদিন দূরে ঠেলে দেবে না তো?'

'না।'

খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বেণুদা! তুমি আমাকে বাঁচালে।'

মনে মনে ভাবলাম, সত্যি বাঁচব কি? নতুন কোনো মোহের আকর্ষণে ভেসে যাব না তো?

বীথিকে কাছে পেয়ে নিজেকে আরো ভালো করে চিনলাম! জানলাম আমার দৈন্য, কাপুরুষতার কথা।

আট

আমি যে মহৎ, মহাপ্রাণ, মহামানুষ নই, তা বরাবরই জানতাম কিন্তু জানতাম না আমি এত নীচ, এত ক্ষুদ্র। জানতাম না আমি এত লোভী। নীতিহীন, আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন। জীবন মহাসমুদ্রে আমি একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকা। সামান্য একটা ঢেউতে ভেসে যাই দূরে। বহু দূরে। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে।

বীথির সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করতাম, আদর করতাম, উপভোগ করতাম ঠিকই কিন্তু তারপর মনে মনে কেমন একটা বিস্বাদ বোধ করতাম। ও যেন ওর রক্ত-মাংসের দেহটা দিয়েই দুনিয়া জয় করতে চায়। ওর হাঁটাচলা কথাবার্তায় কেমন যেন কদর্য তার আভাস-ইঙ্গিত পেতাম। ভালো লাগত না। মনে মনে খুশি হতাম না, অথচ বলতে পারতাম না, প্রতিবাদ করতে পারতাম না। কোন্ সাহসে, কোন্ অধিকারে প্রতিবাদ করব? সমালোচনা করব?

স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছিলাম অনিশ্চিত আগামী দিনগুলোর দিকে। না ছিল দায়, না ছিল দায়িত্ব। বেশ কাটছিল দিনগুলো। পড়াশুনার চাপ ছিল না। অতীশের বাড়ি আড্ডা, বিকেলে খেলা দেখা আর সন্ধ্যার পর বীথিকে নিয়ে বেশ কাটছিল দিনগুলো।

সেদিন শনিবার। বিকেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা। ভোর হতে না হতেই আমি মাঠে লাইন দিয়েছি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। সাড়ে সাতটা-আটটা থেকেই গণ্ডগোল। নটা বাজতে না বাজতেই গণ্ডগোল-মারামারি আরো বাড়ল। অনেকের পিঠে পুলিশের লাঠি পড়ল। মাউন্টেড পুলিশের দৌড়োদৌড়িতে ভয় পেয়ে বহুজন দৌড়োদৌড়ি করতে গিয়ে আঘাত পেল। লাইন ভাঙল, আবার লাইন হল। দুপুরের পর আবিষ্কার করলাম বন্ধুদের হারিয়েছি আর টিকিট পাবার আশা নেই। গণ্ডগোলের সময় খাবারের থলিটা অনেক আগেই হারিয়েছি। ক্ষিদের চোটে পাগল হবার উপক্রম। তবু ঘণ্টাখানেক ঘুরলাম এদিক-ওদিক। যদি কিছু ঘটে যায়। ঘটতেও তো পারে।

না। আর না। আর ভালো লাগল না। বাড়ি ফিরে চললাম।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম। দূর থেকেই মনে হলো বাবার ডিসপেন্সারির সামনে বেশ ভিড়। কি ব্যাপার? এমন ভিড় তো কোনোদিন হয় না। কোনোদিন দেখিনি। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কিন্তু কি হলো? টেনু ভালো আছে তো? ও মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন দৌড়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে যে...

ভাবতে গিয়েও ভয় করল। সর্বনাশা ভাবনা-চিন্তা করারও একটা সীমা আছে। পারলাম না। না, না, টেনুর কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব। ও আমার একমাত্র ভাই। ছোট ভাই। আদরের ভাই। আমার তো আর কোনো ভাই-বোন নেই...

ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন আমাকে দেখতে পেয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে ডাক দিল 'বেণু! শীগগির আয়!'

অমন করে কোনো মানুষ যে ডাকতে পারে তা আমি জানতাম না। জানতাম না পুঁটিয়ারী থেকে রুগি দেখে ফেরার পথে বাবা স্টেটবাসের ধাক্কায়...

দৌড়ে গিয়ে দেখলাম ডিসপেন্সারির সামনের বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে বাবা ঘুমুচ্ছেন। মা আর টেনু বাবার পা দুটো জড়িয়ে পড়ে আছে। ওরাও কি ঘুমুচ্ছে? ওরাও কি শেষ? মাসিমা, বীথি হাউ হাউ করে কাঁদছে। মন্টু পাথরের মতো বাবার মাথার কাছে বসে আছে। আরো কত কি! সে সব কি মনে থাকে? আরো কত লোক কাঁদছিলেন, কতজন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে নেই। আমাকে জড়িয়ে ধরে মাসিমা হাউ হাউ করে কাঁদতেই মার ঘুম ভাঙল। মা শুধু একবার, মাত্র একবার আমাকে টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'বেণু! একি হলো রে!'

উরেঃ বাবা!

আমিও কি একটা বিকট চিৎকার করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি বাবা বেশ সেজেগুজে খাটে ঘুমুচ্ছেন। গলায় ফুলের মালা, মুখে চন্দন। সুন্দর বিছানা। মা, আমি, টেনু বাবাকে প্রণাম করলাম। মাসিমা বীথিও করল। তারপর পাড়ার লোকজন খাট কাঁধে তুলে নিল। আমিও মাঝে মাঝে নিলাম। বাবাকে বিদায় করে দিলাম এই পৃথিবী থেকে। যে মাকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম সেই মাকে আর পেলাম না। মা আবার নতুন কাপড় পরে নতুন করে সাজালেন। শাঁখা নেই, সিঁদুর নেই, চওড়া পাড়ের শাড়ি নেই। নেই সেই লাবণ্য, সেই মাধুর্য আর মুখের হাসি।

পাড়ার লোকেরা যে কি উপকার করেছিলেন তা ভুলবার নয়। সর্বনাশ

ঘটেছিল আটটার পর পরই। সারা পাড়া তখন গম গম করছে। খবর পেয়ে সবাই ছুটে এলেন। অফিস গেলেন না। ওরাই সব কিছু করলেন। তবে বাঙ্গুর হাসপাতালেও নিয়ে যাবার দরকার হয়নি। মণিবাবু দেখেই বললেন, সব শেষ। সেদিন জানিনি, পরে জেনেছিলাম পাড়ার লোকেরা, পাড়ার কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা, সবাই মিলে চেষ্টা করে পোস্টমর্টেম বন্ধ করেছিলেন। আমি মাঠ থেকে ফেরার আগেই পুলিশের পর্ব শেষ হয়েছে।

পরের দিন ছুটে এলেন মেসোমশাই, স্মৃতিদি, জামাইবাবু, গীতি। শূন্য ডিসপেন্সারিতে মালা দেওয়া বাবার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে আবার এক চোট কান্নাকাটি হলো। মেসোমশায়-মাসিমা কাঁদতে কাঁদতেই মাকে, আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

দু'চারদিন পর শ্রাদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলেন মামারা। বিরাট আয়োজন। পাড়ার সবাই এসে বারণ করলেন, কী দরকার এত খরচ করার? বেণু-টেনুকে জীবনে দাঁড় করানই এখন সব চাইতে বড় কথা। মেসোমশাই আর মামারা বললেন, না, না, আপনারা বারণ করবেন না। আপনারা যখন আছেন তখন বেণু-টেনু দাঁড়াবেই!

শ্রাদ্ধ হলো। বিরাট করে হলো। সবাই এসেছিলেন। এম. এল. এ., কর্পোরেশনের কাউন্সিলার থেকে বাদলদা-শিশিরদা পর্যন্ত। সব শেষে মেসোমশাই বললেন, 'হাত জোড় করে সবার কাছে ক্ষমা চাও, ত্রুটি বিচ্যুতি হলে ক্ষমা করতে বলো।' কাঁদতে কাঁদতেই মেসোমশাই বললেন। ওই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি হাত জোড় করেছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারিনি। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম। যাঁরা আমার চারপাশে ছিলেন তাঁরাও সামলাতে পারেননি। রুমাল দিয়ে, ধুতির কোঁচা দিয়ে চোখ মুছেছিলেন সবাই।

আস্তে আস্তে চোখের জল শুকিয়ে এলো। বাড়ির ভিড় পাতলা হলো। মামারা অফিস যাতায়াত শুরু করলেন। মেসোমশাই, জামাইবাবু ফিরে গেলেন। আরো কয়েকদিন পরে গীতি চলে গেল। যাবার আগে লুকিয়ে আমার হাতে একশ' টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দে। দিন পনের পরে এসে আবার দেব।'

'না, না, এর দরকার হবে না। তুই নিয়ে যা।'

'আমি বলছি রেখে দে। হঠাৎ কখন দরকার হবে বলা যায় না।'

'দরকার হলে আমি জানাব। এখন তোর কাছে থাক।'

'বেণু আমার কথা শোন। আমি কি তোর পর?'

আর কিছু বলতে পারিনি। টাকাটা রেখে দিলাম নিজের কাছে।

মেসোমশাই মাকে বলে গেলেন, 'বৌদি, যাচ্ছি। আবার শনিবার আসব।' মা ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে বললেন, আচ্ছা।'

'দাদা চলে গেলেন বলে চিন্তা করবেন না। আমরা তো আছি।'

মা আর কিছু না বলে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেলেন।

বাবা মারা যাবার পর ক'দিন হরি ঘোষের চায়ের দোকানে আড্ডা বসেনি। যারা পলিটিক্স করে তারা পার্টি অফিসে যেতে পারেনি। পাড়ার দেওয়ালে নতুন পোস্টার পড়েনি। আবার ওরা স্বাভাবিক জীবন, কাজকর্ম শুরু করল। আমরাও অনেকটা সহজ, স্বাভাবিক হলাম। তবে আমাদের জীবনধারা পাল্টে গেল। মা আর বাবা খুব ভোরে উঠতেন। সাতটার ডিসপেন্সারিতে বসার আগেই বাবা স্নান সেরে চা খেতেন। মাও তৈরি হতেন। এখন আর ভোরে উঠে তৈরি হন না। ঘুমোন না কিন্তু শুয়ে থাকেন। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বাবার জামা-কাপড় ফটোর দিকে। টেনু উঠে পড়ে কিন্তু নিঃশব্দে আপন মনে একটু পড়াশুনা করে ফিরে আসে মার বিছানার পাশে। ক্ষিদে পেলেও বলে না। কখনও ও ভিতরের দরজা দিয়ে ডিসপেন্সারিতে গিয়ে রুগিদের চেয়ারে বসে থাকে। কোনোদিন বাবার চেয়ারে বসে না। বড় কষ্ট লাগে ওকে দেখলে। ও যদি কাঁদত, চিৎকার করে কাঁদত, তাহলে অত কষ্ট পেতাম না কিন্তু ওর নিঃশব্দ ঘোরাফেরা, ডিসপেন্সারিতে বসে থাকা অসহ্য।

অসহ্য আরো অনেক কিছু। কি করব? চুপ করে মুখ বুজে বসে থাকি।

স্মৃতিদিই এখন আমাদের সংসার সামলাচ্ছে। আমাদের সবার রান্নাই একসঙ্গে হয়। মা অবশ্য বার বার বলছেন আমাদের জন্য মাছ আনতে। আনছি না। মার সামনে বসে আমরা মাছ খাব আর মা সামান্য একটু ডাল-তরকারি দিয়ে আতপ চাল খাবে, তা হয় না। হচ্ছে না।

আমাদের অনুপস্থিতিতে মা স্মৃতিদিকে বলেছেন, 'হ্যাঁরে, তুই বরং দিদিকে বল ওদের একটু মাছ-ভাত খাওয়াতে।'

স্মৃতিদি বারণ করেছে, 'কি দরকার মাসিমা? ওদের যখন মন চাইছে না তখন জোর করার কি দরকার?'

'ওদের সঙ্গে সঙ্গে তুইও তো খাচ্ছিস না। সধবাদের একটু আঁশের ছোঁয়া খেতে হয়।'

'আমরা কি রোজ মাছ খাই?'

মা আর কিছু বলেন না।

আগে আমাদের শুতে শুতে অনেক রাত হতো। দশটা-সাড়ে দশটায় বাবা ডিসপেন্সারি বন্ধ করে এসে স্নান করতেন। তারপর খাওয়া-দাওয়া একটু-আধটু গল্পগুজব। সাড়ে এগারোটা-বারোটা রোজই হতো। তাছাড়া আমি পড়তাম। কোনো কোনোদিন একটা-দেড়টা পর্যন্ত পড়তাম। এখন সাড়ে আটটা-নটার মধ্যে সবকিছু মিটে যায়। মা আর টেনু বাবার ঘরে গেলে আমিও আমার ঘরে চলে আসি। স্মৃতিদি কোনোদিন মার কাছে, কোনোদিন আমার কাছে বসে গল্প করে। ঠিক এমনি সময় মাসিমাও সংসারের সব কাজকর্ম সেরে চলে আসেন মার কাছে।

আমি অন্ধকার ঘরেই চুপটি করে শুয়েছিলাম। স্মৃতিদি এল। আলো জ্বালল। 'কিরে ঘুমুচ্ছিস?'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বললাম, 'না।'

'আলো জ্বালা থাকবে?'

'থাক।'

ও আমার কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত দিতে দিতে বলল, 'আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব?'

'না, না, তোমার কষ্ট করতে হবে না।'

'এতে কষ্টের কী আছে?'

'সারাদিন সংসার ঠেলার পর এখন একটু বিশ্রাম করতে যাও।'

'তাতে কী হল? আমি কি সংসার করি না?'

আমি চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়েই শুয়ে আছি। ও ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী এত ভাবছিস?'

তবু আমি চুপ।

'ভেবে কি হবে? যা হবার তা তো হয়ে গেল। এখন নিজের চিন্তা কর। ভেবে ভেবে মন খারাপ করিস না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, না, ভাবব আর কি? ভাবনা-চিন্তার বাইরেই সব কিছু ঘটে গেল।

'দুঃখ করিস না বেণু। অদৃষ্টের উপর তো কারুর হাত নেই।'

আবার একটু চুপচাপ।

স্মৃতিদি বলল, 'আমার দিকে ফিরবি না?'

'আলোটা বড্ড চোখে লাগে।'

ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে সুইচটা অফ্ করে দিল। আমার বিছানার ধারে বসে বলল,

'এদিকে ফিরে শো।'

ফিরলাম। ও আমার মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। এবার ঘুমো।'

'ঘুম আসছে না।'

'একেই তো এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেল তারপর না ঘুমোলে শরীর ভেঙে পড়বে যে।'

'ঝড় বয়ে গেল কোথায়? আসল ঝড় তো এখনও শুরু হয়নি।'

'অত ভাবিস না বেণু। সময় এসে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তবুও যে না ভেবে পারি না। ভাবতে ভাবতে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাব।'

স্মৃতিদি আমার মুখের উপর মুখ রেখে বলল, 'দূর পাগল! এসব কথা বলে নাকি?'

'কি করে আমি মাকে, টেনুকে বাঁচাব বলতে পার? অথচ ওদের তো কেউ নেই, ওরা তো আমার মুখ চেয়েই–'

আর বলতে দিল না ও। আমার মুখ চেপে ধরে বলল, 'কি আজে বাজে ভাবছিস? তুই লেখাপড়া শিখেও এত ভয় পাচ্ছিস?'

'সংসারের কিছুই যে জানি না, বুঝি না। ভয় পাব না। ভীষণ ভয় করছে।'

মাসিমা এলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্মৃতিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে খুকি, বেণু ঘুমিয়েছে?'

'না, মা। দেখ না কি সব আজে বাজে কথা বল্‌ছে।'

মাসিমা আমার কাছে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, লক্ষ্মী বাবা আমার! একটু নিজেকে সামলাও। তা না হলে দিদি আর টেনু কি ভাববে বল তো!'

আর সামলাতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম, 'ওদের কি করে বাঁচাব বলুন তো মাসিমা?'

মাসিমারও গলাটা ভিজে উঠল, 'সবই বুঝি বাবা! তবুও তোমাকেই তো সবকিছু সামলাতে হবে। তবে ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি বুদ্ধিমান, লেখাপড়া শিখেছ, এত ভয় পাবে কেন?'

মাসিমা আঁচল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় স্মৃতিদিকে বললেন, 'মাসিমার দিকে খেয়াল রাখিস।'

'আচ্ছা।'

আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে আমিই কথা বললাম, 'তুমি আসানসোল কবে যাবে?'

'কেন?'

'এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। আর কতকাল নিজের সংসার ফেলে আমাদের সংসার ঠেলবে।'

'তাতে কি হয়েছে? আমি কি তোদের কেউ না?'

'আমি কি বলেছি? জামাইবাবুর একলা একলা থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?'

'হলে কি করব? তাই বলে কি মাসিমার ঘাড়ে এখন সংসারের দায়িত্ব দিয়ে পালাব?'

'তাই বলে আর কতদিন? অনেকদিন তো হলো।'

'অনেক দিন কোথায়? সামনের শনিবার তো একমাস হবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'তুমি এবার মার কাছে যাও, আমি ঘুমিয়ে পড়ছি।'

'ঠিক ঘুমুবি তো?'

'হ্যাঁ।'

স্মৃতিদি মার ঘরে শুতে চলে গেল। আমিও জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

গড়িয়ে গড়িয়ে কোনোমতে দিনগুলো পার হচ্ছিল। শনিবার মেসোমশাই, জামাইবাবু, গীতি এলো। মামারা কদিন আসতে পারেননি। শনিবার বিকেলে ওঁরাও এলেন।

সেদিন টেনু আর মন্টুকে নিয়ে গীতি ডিসপেন্সারিটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলো। বাবার ফটোটা ভালো করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপ জ্বেলে দিল। শ্রাদ্ধের পর ডিসপেন্সারির দরজা প্রথম খোলা হলো।

বিকেলেবেলার দিকে অফিস ফেরত অনেকেই ডিসপেন্সারিতে এলেন। নিঃশব্দে বসলেন। সন্ধ্যার পর বেশ ভিড় হয়ে গেল। পাড়ার কে যেন কোথা থেকে একটা বড় সতরঞ্চি নিয়ে এসে সামনের বারান্দায় বিছিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মিলন সমিতির হারমোনিয়াম, খোল, করতাল এলো। শুরু হলো হরি ঘোষের কীর্তন। ওই চায়ের দোকানের হরি ঘোষ যে এত ভালো কীর্তন জানেন, তা জানতাম না। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ল। খবর পেয়ে পাড়ার অনেক মেয়েরাও এলেন। ধবধবে সাদা থান পরে ঘোমটা দিয়ে মাও এলেন মাসিমার হাত ধরে।

কীর্তন ভাঙল অনেক রাত্রে। হরিদার দুটো হাত ধরে বললাম, 'অপূর্ব

গেয়েছেন!'

'ইচ্ছা করলেই কি কীর্তন গাওয়া যায়? তোমার বাবা সৎলোক ছিলেন বলেই তো এমন গাইতে পারলাম।'

আমার পুরনো দিনের যেসব বন্ধুরা সব কিছু করলো, যারা এখন হরি ঘোষের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, ফাজলামি করে, তাদের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিতে ইচ্ছে করল। পারলাম না। ওদের কাছে গিয়ে শুধু বললাম, তোরা না থাকলে যে কিভাবে এই সব হতো, তা ভাবতেও পারি না।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, 'তুইও আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছিস?'

'না, না, ধন্যবাদ জানাব কেন? শুধু বলছিলাম...'

'যা, এবার মাসিমাকে নিয়ে ভিতরে যা।'

মনের মধ্যে অনেক স্মৃতি ভিড় করলেও মনে মনে বেশ তৃপ্তি পেলাম। শান্তি পেলাম। মনে মনে একটু সাহসও পেলাম। মনে হলো, এত যার সহায় তার ভয় কি?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ভিতরের বারান্দায় বসে বসে এই সবই আলোচনা হচ্ছিল। জামাইবাবু বললেন, 'সত্যি জ্যাঠামণিকে কত লোক ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

মেসোমশাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'দাদা কি মানুষ ছিলেন? সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন। উনি না থাকলে কি আমরা বেঁচে থাকতাম?'

মা বললেন, 'ওকথা বলো না ঠাকুরপো। ওর তো অনেক কিছুই ইচ্ছা ছিল কিন্তু অবস্থায় কুলোতো কোথায়?'

কি বলছ বৌদি? আমার জন্য দাদা কি করেননি বল তো?'

একটু পরে আমি জামাইবাবুকে বললাম, 'কদিন আছেন?'

'আমি কালই চলে যাব।'

'স্মৃতিদিকে নিয়ে যাচ্ছেন তো?'

'তোমাদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে আমি ওকে নিয়ে চলে যাব?'

'এক মাস তো হলো। আর কতদিন আপনি একলা একলা থাকবেন?'

'আমার জন্য কিছু চিন্তা করো না। ওকে এখন নিয়ে গেলে ওরও ভালো লাগবে না।'

আর কি বলব?

এতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গীতি স্মৃতিদিকে বলল, 'দিদি, তুই আজ বাড়িতে

থাক। আমি মাসিমার কাছে থাকব।'

স্মৃতিদি বোধহয় একটু লজ্জা পেল। 'কেন? কি দরকার?'

'না, না আজ আমি থাকি। আমি তো দু'একদিন পরেই চলে যাব।'

সে রাত্রে গীতি আমাদের বাড়ি ছিল। সেই প্রথম। এর আগে ও কোনোদিন আমাদের বাড়িতে রাত কাটায়নি। স্মৃতিদি কাটিয়েছে। বিয়ের আগেও কাটিয়েছে! শিব রাত্তিরে, টেনুর জন্মদিনে বা অন্য কোনো কারণে, উৎসবের জন্য কাজকর্ম করতে করতে বেশি রাত হলে আর বাড়ি যেত না। মা বারণ করতেন। আমি মাসিমাকে খবর দিয়ে আসতাম।

ওরা সবাই চলে যাবার পর মা একবার গীতিকে বলেছিলেন, 'তুইও বাড়ি গেলে পারতিস।'

'না মাসিমা, আমি যে কদিন আছি, আপনার কাছেই থাকব।'

'জামাই এসেছে। তুই গিয়ে একটু গল্প-টল্প করলে পারতিস।'

'এত রাত্রে আর কি গল্প করব? ওরা তো এখনই শুয়ে পড়বে।'

গীতি ছিল। মার কাছে বসে বসে কথাবার্তা বলছিল। মার গায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমিও ঘুমুইনি। জেগে ছিলাম। ওদের কথাবার্তা কানে ভেসে আসছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হচ্ছিলাম নানা কথা ভাবতে ভাবতে। বিছানার পাশের জানালা দিয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে দেখছিলাম। ঘুম আসছিল, তবুও ঘুমুচ্ছিলাম না। ভাবছিলাম গীতি এলে ওকে ধন্যবাদ জানাব। আজ এক মাস হলো বাবা মারা গিয়েছেন। সকাল থেকেই সবার মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল একটু কিছু করলে হতো কিন্তু কে করবে? কার উৎসাহ আছে? কোনো কাজেই যে কারুর উৎসাহ নেই। ও যদি টেনু আর মন্টুকে নিয়ে ডিসপেন্সারিটা এমন করে পরিষ্কার না করত, বাবার ফটোটায় চন্দন পরিয়ে মালা-টালা দিয়ে না সাজাত, তাহলে তো আজকের এমন সুন্দর অনুষ্ঠানটা হতে পারত না।

ধন্যবাদ জানানো হলো না। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েই পড়লাম।

ভয়ে প্রায় চিৎকার করতে গিয়েছিলাম। গীতি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল, 'চুপ কর।'

'তুই উঠে এলি?'

'হ্যাঁ।'

'মা টের পেলে?'

'মাসিমা এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।'

'উঠে এলি কেন?'

'তুই আজকাল এমন চুপচাপ একলা থাকিস যে তোর জন্য আমার বড় চিন্তা হয়।'

আমি কোনো কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম। গীতি নির্বিবাদে আমার পাশে শুয়ে পড়ল, 'তোকে একটু কাছে নিয়ে সান্ত্বনা জানাব বলে এই একমাস কত ভেবেছি জানিস?'

আমি ছোট্ট উত্তর দিলাম, 'জানি।'

ও পাশ ফিরে শুয়ে আমার মুখের ওপর আলতো করে হাতটা রেখে বলল, 'কি করে জানলি?'

'তোর মতন তো কেউ আমার কথা ভাবে না, ভালোবাসে না।'

ও একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'জানি না, তবে তোর কথা না ভেবে পারি না। সব সময় তোর কথা ভাবি।'

আমি আবার চুপ করে রইলাম।

একটু পরে ও আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বেণু আর মন খারাপ করিস না। এবার সোজা হয়ে দাঁড়া। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়। তুই তো ছেলে! তোর ভয় কিরে?'

এই এক মাসে বহু লোক সমবেদনা জানিয়েছেন কিন্তু এমন করে তো কেউ আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলেননি? উৎসাহ দেননি? শোকে-দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গেছি, হতবাক হয়ে গেছি। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার কথা মনেই আসেনি। একেবারেই ভাবিনি। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে যেন প্রথম আশার আলোর ইঙ্গিত পেলাম।

ওর হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, 'তুই যদি কলকাতায় থাকতিস তাহলে খুব ভালো হতো।'

'তাতে কি হতো?'

'সংসারের ব্যাপারে তো আমি বুঝি না। তুই থাকলে তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতাম।'

'তুই মাঝে মাঝে বাঁকুড়া আসিস না।'

'তাই কি হয়?'

'তাতে কিছু হবে না। আসিস। খুব ভালো হবে।'

গীতি চলে গেল। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বস্তিতে, শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

নয়

বীথির চিঠিটা পেয়ে সব মনে পড়ল। কটা বছরের মধ্যে কত কি হয়ে গেল! ভাবলেও অবাক লাগে।

একবার ভাবলাম টেলিগ্রাম করে জানাই আমি দিল্লির বাইরে যাচ্ছি। আবার ভাবলাম, না, তা হয় না। এমন করে ওকে অপমান করার অধিকার আমার নেই। তাছাড়া মাসিমা-মেসোমশাই ভীষণ দুঃখ পাবেন। অবাক হবেন। মাও হয়তো রাগ করবেন। ওদের বাড়ি থেকে আর কেউ দিল্লি আসেনি। আমার কোনো সাহায্য চায়নি। বীথি প্রথম আসছে। আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। উচিত নয়।

ওই নোংরা শিশিরদার সেবা করে ফিল্মে নামার জন্য বীথির উপর ভীষণ রাগ হয়। ঘেন্না হয়। আগে কত বড় বড় কথা বলত অথচ আজ নিজেই ওই সব নোংরা লোকগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছে। ওদের খুশি করছে। আশ্চর্য! আমি ফিল্মের ব্যাপারে কিছু জানি না কিন্তু আমাদের টালিগঞ্জের অনেকেই খোঁজ-খবর রাখে। যেটুকু শুনতে পাই তাতে বিশেষ সুবিধার বলে মনে হয় না। নাম করা হিরো হিরোইনদের ব্যাপার আলাদা। সবাই ওদের তেল দেয় কিন্তু যারা সাধারণ, যারা ছোটখাটো রোলে নামে, নামতে চায়, তাদের নিয়ে তো প্রায় হরির লুঠ খেলা হয়।

টাকার জন্য বীথি ফিল্মে নামল কেন? টাকা রোজগারের আর কি পথ নেই? উপায় নেই? এত টাকার ওর কি প্রয়োজন? এত টাকার নেশা কেন? ও এখনও ছোটখাটো রোলেই অভিনয় করে। তবে অনেক বইতে করেছে। করে। আমি ওর একটা ফিল্ম দেখেছি। তাও জোর করে নিয়ে গিয়েছিল বলেই গিয়েছিলাম। ভালোই লেগেছিল। চেহারাটা তো আছে! তারপর দারুণ ফ্রি। উচ্চারণও বেশ স্পষ্ট। উজ্জ্বলার সিঁড়ি দিয়ে যখন আমরা নীচে নামছিলাম তখন কয়েকটা মেয়ে এসে ওর অটোগ্রাফ পর্যন্ত নিল। মেন গেট থেকে বেরুবার সময় একজন ছেলে ওকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি তো অবাক। ওর এই পপুলারিটি দেখে খারাপ লাগে নি, বরং ভালোই

লেগেছিল। আমরা তো ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। বীথি হারাল না। হারাবে না।

পাড়ার ছেলেদের কাছে টুকটাক নানারকমের মন্তব্য শুনে মনটা আবার বিস্বাদে ভরে গিয়েছিল। এখনও সে বিস্বাদ আছে। যায়নি। যাবার কোনো সম্ভাবনাও দেখছি না।

তাছাড়া আবার দিল্লিতে কেন? এখানে আর যাই হোক রক্তের নেশায় পাগল হইনি। হই না। হবো না! কিছুতেই না। কলকাতা ছাড়ার আগে বীথির নেশায় আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। বাবা মারা যাবার পর অনেক দিন বেশ ছিলাম কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন আবার বাঁধ ভেঙে গেল। সবসময় বাড়ির মধ্যে একলা একলা থাকতে মার ভালো লাগতো না। তাই তো টেনুর স্কুল ছুটি হলেই মা টেনুকে নিয়ে মামা-মাসিদের কাছে চলে যেতেন। ওই ছুটির মধ্যেই মামারা মাকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাইরেও ঘুরে আসতেন। আমি যেতাম না। ক্যানিং স্ট্রিটের ওই বিয়ানী ব্রাদার্সের সামান্য চাকরির অসাধারণ গুরুত্ব দেখিয়ে বাড়িতেই থাকতাম। তখন কি বাড়ি ছেড়ে যাবার উপায় ছিল?

এসব সত্ত্বেও বীথির মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। ওর উপর আমার কোনো দাবী ছিল না। যা পেতাম, যা নিতাম, অন্যায় করে নিতাম। চোরের মতো লুকিয়ে নিতাম। ওকে ভালোবাসতাম কিনা জানি না কিন্তু ওর প্রতি অন্যের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেখলে, ওকে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে দেখলে বিশ্রী লাগত। মন খারাপ হতো। ওকে যত বেশি আমার নিজস্ব দুনিয়ায় দেখতে চাইতাম, পেতে চাইতাম, ও যেন তত বেশি উদার হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইত।

আর গীতি?

ও দূরে যাবার পর যেন আমাকে আরো কাছে টেনে নিল। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে বেশি জড়িয়ে ফেলল। ...বেণু, তোর চিঠিতে ডিসপেন্সারি-ঘর ভাড়া দেবার ব্যাপারে মাসিমার অমতের কথা জানলাম। জ্যাঠামণির ওই ডাক্তারখানায় অন্য কেউ অন্য কোনো ব্যবসা করবে, ভাবতেও কষ্ট লাগে। মাসিমার মনে দুঃখ লাগা স্বাভাবিক কিন্তু এই পৃথিবীটা তো শুধু সেন্টিমেন্টের জায়গা নয়। ভাবাবেগের মূল্য, চোখের জলের মূল্য এখানে বড় কম। ডিসপেন্সারিটা ভাড়া না দিতে পারলেই ভালো হতো কিন্তু এখন তো সংসারে টাকার দরকার। জ্যাঠামণির ইন্সিওরেন্সের টাকা ভেঙে আর তোর বিয়ানী ব্রাদার্সের কৃপায় কতদিন চলবে? মাসীমাকে বুঝিয়ে রাজি করা। দরকার

হলে আমি যেতে পারি। বাবা বললে মাসিমা মেনে নিতেন কিন্তু বাবা তো আরও বেশি সেন্টিমেন্টাল।

আরো কত কি লিখত। লিখত আমার চাকরি-বাকরি পড়াশুনার ব্যাপারে। ...রবিবারের কাগজে পোর্ট কমিশনার্সের বিজ্ঞাপন দেখলাম। নিশ্চয়ই দরখাস্ত করবি। তোর একটা ভালো চাকরি হলে সবদিক থেকে ভালো। অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। তাছাড়া ভালো চাকরি হলেই তুই আবার পড়াশুনা করতে পারিস। ভালো ভাবে এম. এ. পাশ করলে তুই হয়তো কোনো না কোনো কলেজে প্রফেসর হয়ে যাবি। তুই প্রফেসর হলে মাসিমা কত খুশি হবেন, ভাবতে পারিস?

আমি চিঠি পড়তে পড়তে হাসতাম। ওর নিজের খুশির জন্যই যে আমাকে এম. এ. পাশ করে প্রফেসর হতে বলত, তা স্বীকার করত না।

গীতি আর বীথি জোয়ার-ভাঁটার টানে মনের মধ্যে এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব জন্ম নিল। এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই আমার দিল্লি আসা। তা নয়তো কলকাতা থাকলে আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলে বা পোর্ট কমিশনার্সে সত্যি একটা চাকরি পেতাম। কিছুদিন আগে বা পরে। এম. এ. পড়াও হতো। তাছাড়া বাড়িতে থেকে মা আর টেনুর দেখাশুনা করতে পারতাম। তবুও দিল্লি এসেছি। মার একটুও মত ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর আমাদের দুই ভাই সম্পর্কেও মার দারুণ ভয়, আতঙ্ক। আমাদের কখন কি বিপদ হয় সেই চিন্তাতেই উনি পাগল। দিল্লি আসতে মার একটুও মত ছিল না। অনেক বুঝিয়েছিলাম। সরকারি চাকরি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। ছুটি পেলেই চলে আসব। আরো কত কি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ভালো চাকরি পেলেই কলকাতা ফিরে যাব। এত কাণ্ডের পর দিল্লি আসি।

দু'বছরের ওপর দিল্লি এসেছি। প্রথম কিছুকাল খুব ভালো লেগেছিল। কলকাতায় যেন ভালোভাবে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। সারা শহরটা যেন হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড। সবই যেন মুমূর্ষু। প্রথম দিল্লি আসার পর সারা শহরটাকে স্যানাটোরিয়াম মনে হয়েছিল। সুন্দর সাজানো গোছানো। পরিষ্কার ঝকঝকে বিরাট চওড়া রাস্তা। মাঝে অথবা ধারে ফুলের কেয়ারী। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে গোল পার্ক। কলকাতায় একটা গোলপার্ক আর এখানে শত সহস্র গোল পার্ক। তার মাঝখানে রঙিন জলের ফোয়ারা। সব রাস্তাতেই নিয়ন লাইট। বাড়িগুলোও কি সুন্দর! সবই নতুন। প্রায় সব বাড়িতেই লন। ফুলের বাগান। দরজা-জানালায় পর্দা, ড্রয়িংরুমে সোফা সেট।

কেরানী থেকে মিনিস্টার, বড় সাহেবের বাড়িতে পর্যন্ত।

প্রথম প্রথম ভাবতে পারতাম না দিল্লিও ভারতবর্ষের একটা শহর! এত ভালো, এত সুন্দর! কলকাতায় একটা নিউ আলিপুর আর এখানে সারা শহরটাই নিউ আলিপুর! নতুন দিল্লিতে অনেক ঘুরেও বৌবাজার-শিয়ালদ'-বৈঠকখানা বা শ্যামবাজার-বাগবাজার আবিষ্কার করতে পারিনি। মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

সবকিছু দেখেই অবাক হতাম! হয়েছি। কলকাতার রাজভবনে মন্ত্রীদের কোয়ার্টার দেখে আগে দারুণ হিংসা, ঈর্ষা হতো। এখানে এসে দেখলাম একটু উপরতলার কেরানীবাবুরা ওই রকম কোয়ার্টারে থাকেন। কলকাতার অফিসে বসার জায়গা পাওয়া যায় না, আর এখানে এসে দেখলাম পিয়ন-চাপরাশী-হতভাগ্য কেরানীবাবুদের সাইকেল রাখার জন্য দোতলা বাড়ি থাকে। আজব ব্যাপার! কলকাতায় ফুটপাতের ভিড় উপচে রাস্তায় পড়ে আর এখানে ফাঁকা ফুটপাত দিয়ে সাইকেল স্কুটার চলে। এখানকার রাস্তায় মানুষের চাইতে গাড়ির ভিড় বেশি। অসংখ্য অজস্র কেরানীরাও এখানে বাসে চড়েন না। নিজের স্কুটারে চড়েন। কলকাতায় যেসব অফিসার ফার্স্ট ক্লাশ ট্রামের মান্থলি কাটেন না, তাঁরাও এখানে এসে ফিয়েট-অ্যাম্বাসেডর চড়ে সব্জিবাজার করতে যান।

একি ইউরোপ না আমেরিকা?

শীতকালে শাল-আলোয়ান কেউ ব্যবহার করেন না। সবাই স্যুট-টাই। কেরানী থেকে আই. সি. এস পর্যন্ত সবাই। কলকাতার সিনেমায় দশ আনার টিকিট লাইন দিয়ে কাটাতে হয়, এখানে দু'টাকা চল্লিশের টিকিট অমন করে কিনতে হয়। পি. সি. সরকার ম্যাজিক দেখাতে এসে বলেছিলেন এখানে পঁচিশ টাকার টিকিট আগে বিক্রি হয়, পাঁচ টাকার টিকিট শো আরম্ভ হবার সময়েও বিক্রি হয় না। ম্যাজিকের রাজাও দিল্লির ম্যাজিক দেখে অবাক হয়েছিলেন।

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো প্রথম কিছুকাল শুধু অবাক হয়ে দেখেছি। দেখেছি আর ভেবেছি। ভেবেছি মানুষের মতো বাঁচতে হলে এখানেই থাকতে হয়। থাকতে হবে। থাকব। ওই নোংরা মুমূর্ষু কলকাতায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরব না। কিছুতেই না।

মোহ কাটাতে বেশ কিছু সময় লাগল। আস্তে আস্তে বিচার শক্তি ফিরে পেলাম। বুঝতে পারলাম এখানে রসের চাইতে রঙের দাম বেশি। হৃৎপিণ্ডের চাইতে পেশীর সম্মান, প্রয়োজন বেশি। ঢাকার মাটি লাল কিন্তু রসহীন। বাঙলাদেশের মাটি কালো হলেও রসে ভরা। কলকাতায় গরিব মানুষ পেটের

দায়ে ভিক্ষা করে ; এখানে বড়লোকের ছেলেরা ফুর্তির জন্য মোটর গাড়ি চুরি করে। কলকাতায় যতগুলো মদের দোকান, এখানে ততগুলো বইয়ের দোকানও নেই। কলকাতায় লোকে লুকিয়ে মদ খায়, এখানে প্রকাশ্যে, সবাইকে জানিয়ে মদ খাওয়াটাই সামাজিক মর্যাদার অন্যতম মাপকাঠি। আমরা কলকাতার ছেলেরা ভালোভাবে ইংরেজি বলতে পারি না কিন্তু শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারি। এখানকার লোকেরা গড় গড় করে ইংরেজি বললেও শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারে না। কলকাতার দোকানদাররা মিষ্টি কথা বলে, খদ্দেররা মেজাজ দেখায়। এখানে দোকানদাররা মেজাজ দেখায় খদ্দেররা চোর! কলকাতার অবাঙালিরা বাংলা শেখে, এখানকার বাঙালি ছেলেমেয়েরা বান্ডিল বান্ডিল টাকা খরচ করে বাংলা ভুলে যায়।

ভালো লাগে না। তবু চাকরির জন্যে পড়ে আছি। আর পড়ে আছি মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য। সেদিক থেকে ভালোই আছে। বীথি এলে আবার মনটা চঞ্চল হবে। আবার রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠব। কলকাতা থেকে এত দূরে, এত নিবিড়ভাবে কাছে পেলে পাগল না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

চিঠিটা পড়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত হয়ে গেল। হোটেলে যেতে আর ইচ্ছা করল না। সময়ও ছিল না। জামা-প্যান্ট ছাড়ব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় সায়গল সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার? খানা খেতে গেলে না?'

'না। আজ আর যাব না।'

'কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

'না। ক্ষিদে নেই, তাছাড়া বাড়ির চিঠি পড়তে যেয়ে রাত হয়ে গেল।'

'মাতাজি ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর সব ঠিক আছে তো?'

'আমার এক বোন আসছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'বেড়াতে?'

'শুধু বেড়াতে না, একটু কাজে আসছে।'

'তোমার ভাবীজিকে বলেছ?'

'এখনও বলা হয়নি। এইতো চিঠি পেলাম!'

সায়গল সাহেবই ভাবীজিকে বললেন, 'শুনা হ্যাঁয়? দত্তা সাহেবের বোন আসছে।'

সায়গল সাহেব আমাদের অফিসেরই একজন ইউ-ডি-সি। নিছক ভদ্রলোক। ব্যাচেলার বলে যখন কোথাও একখানা ঘর পাচ্ছিলাম না তখন উনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। পরদেশি শিক্ষিত ছেলে বিপদে পড়েছি বলেই একটা ঘর দিতে রাজি হলেন। শুধু একটা শর্ত। রান্না করা চলবে না।

যেন মার্কেটের একটা হোটেলে খাই। পঞ্চান্ন টাকা লাগে। ঘরের জন্য পঁয়তাল্লিশ। অর্থাৎ একশ' টাকায় থাকা-খাওয়া। ভালোই আছি। আরো ভালো আছি সায়গল সাহেবের স্কুটার থাকার জন্য। রোজই ওর স্কুটারের পিছনে বসে যাই। অনেকদিন ফিরেও আসি ওঁরই সঙ্গে। আমি নিজে থেকে এই সুযোগ চাইনি। উনি বলেছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন।

ভাবীজিও বেশ ভালো! মিশুকে। আগে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে মাস্টারি করতেন। ছাড়তে হয়েছে। এখন সারাদিনই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ফুরসত পেলে আমার সঙ্গে একটু-আধটু গল্প করেন।

'তোমাদের কলকাতার কথা আমার খুব সামান্য মনে পড়ে।'

'আপনি কলকাতা গিয়েছেন বুঝি?'

'গিয়েছি। অনেকদিন আগে।'

'কতদিন আগে?'

'আমার তখন সাত-আট সাল বয়েস হবে।'

'বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার চাচা তো এখনও কলকাতায় থাকেন।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'ভবানীপুরে।'

'আপনার চাচা ওখানে কী করেন?'

'উনি খিদিরপুর ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান ছিলেন। রিটায়ার করেছেন তবে ফ্যামিলি কলকাতাতেই সেটল্ড।'

'আপনারা আর কলকাতা যান না?'

'না। আর যাওয়া হয়নি।'

'চলুন, আর একবার ঘুরে আসবেন।'

ভাবীজি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আর গিয়েছি! এখন শুধু

গুরুদাসপুর আর অমৃতসর, অমৃতসর আর গুরুদাসপুর!

ভাবীজির দুটি ছেলে। রোনি আর সোনি। রোনি এবছরই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সোনি এখন নিজের খেয়াল খুশি মতো জীবন কাটাচ্ছে। ভারি মিষ্টি ছেলেটা। আদর করি। টফি-চকলেটের লোভ দেখিয়ে অনেকক্ষণ আমার কাছে আটকে রাখি। একটা দুটো বাংলা কথা শেখাই। শিখিয়েছি।

বেশ মজা লাগে। ওদের। আমার। রোনি-সোনির। সবার।

সায়গল সাহেবকে বাড়ির কথা বলেছি। ভাবীজিকে বেশি বলেছি। মাসিমা, মেসোমশাই, স্মৃতিদি, গীতি, বীথির কথাও বলেছি। তাইতো বোন আসছে শুনেই ভাবীজি রান্নাঘর থেকে বারান্দায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ বোন আসছে? গীতি?

'না। বীথি।'

'বেড়াতে আসছে?'

'ঠিক বেড়াতে না।' ফিল্মের কথা না বলে শুধু বললাম, ওদের কলেজ থেকে কি একটা ড্রামা করতে আসছে।

'কদিন থাকবে?'

'তা কিছু লেখেনি। হয়তো পাঁচ-সাত দিন।'

ভাবীজি খুশিই হলেন।

ডিল্যুক্স মাত্র পনের মিনিট লেট করে এলো। এক নম্বর চেয়ার কার থেকে বীথি নামল। টিপ্-টপ্ সাজগোজ। চোখে গো-গো সানগ্লাস। হাজার হোক ফিল্ম অ্যাকট্রেস! আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম। একটু অপেক্ষা করলাম। একটু পরে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখেই ও খুশিতে ঝলমল করে উঠল। আমি ওর গো-গো সানগ্লাসের মধ্য দিয়েও দেখতে পেলাম একটু দুষ্টু দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখল। কিছু বলল।

বীথি জানে আমি ফিল্মের লোকদের বিশেষ পছন্দ করি না। তাই শুধু অশোকবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'অশোকবাবু, এই যে আমার দাদা। এর কাছেই আমি থাকব।'

অশোকবাবু বললেন, 'সকালে লোকেশন দেখতে যাবার আগে আসবে তো?'

'নিশ্চয়ই। আপনারা ক'টায় বেরুবেন?'

'ব্রেকফাস্ট খেয়ে নটা নাগাদ।'

'ঠিক আছে।'

আমি বীথিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওঁরা কোথায় থাকবেন জানিস তো?'

'লোদী হোটেল। তুমি তো নিশ্চয়ই চেন।'

'হ্যাঁ।'

অশোকবাবুকে নমস্কার করে বীথির সুটকেশটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টেশনের বাইরে এলাম। ও জিজ্ঞাসা করল, 'কিসে যাব? ট্যাক্সিতে তো?'

'এখানে ট্যাক্সি ভীষণ কস্টলি। স্কুটারেই...'

কথাটা শেষ করতে দিল না, 'তাতে কিছু হবে না। চল ট্যাক্সিতেই যাই।'

কোনো কথা না বলে শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম।

'হাসছ কেন?'

'দেখছি ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের কেমন মেজাজ হয়।'

'বাজে কথা বলো না। কি মেজাজ দেখালাম?'

'মেজাজ মানে পয়সার গরম।'

'আমি তোমার কাছে পয়সার গরম দেখাব?'

স্কুটারেই গেলাম। কনট প্লেস, পার্লামেন্ট স্ট্রিট, পার্লামেন্টের পাশ দিয়ে, নর্থ-সাউথ ব্লকের মাঝখান দিয়ে, রাষ্ট্রপতি ভবনের ফ্রিম্যান এভিনিউ-সাউথ এভিনিউ, তিনমূর্তি, চাণক্যপুরী, বিনয় মার্গ পার হয়ে এলাম আমাদের সরোজিনী নগরে। অতীতের বিনয় নগরে। বীথির দারুণ ভালো লাগল। আপন মনে বলল, সত্যি বেড়াবার জায়গা। তারপর আমাকে বলল, 'সব ঘুরিয়ে দেখাবে তো?'

'দেখাব।'

'খুব ঘুরব।'

'আমি অফিস যাব না?'

'আমি যে কদিন থাকব যাবে না।'

'একেবারেই যাব না?'

'না।'

'চাকরি চলে যাবে যে!'

'চাকরি গেলে দেখা যাবে।'

'ফিল্মের সুটিং কদিন চলবে?'

'দিন তিনেক।'

'তুই কি ওদের সঙ্গেই ফিরে যাবি?'

'ওদের সঙ্গে ফিরব কোন্ দুঃখে?'

'তার মানে?'

'তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে।' ও নির্বিবাদে বলল।

আমি চমকে উঠলাম, 'আমি যাব কেমন করে?'

'তুমি না নিয়ে গেলে আমি যাচ্ছি না।'

'সেই ভালো।'

ভাবীজি বীথিকে দেখে প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 'বাঃ! তোমার বোনকে তো ভারি সুন্দর দেখতে।'

বীথি হাসল, আমিও হাসলাম।

ঘরে ঢুকেই বীথি চারপাশ দেখে নিল। 'বেশ তো সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছ।'

'কেরানির ঘরে অভিনেত্রী থাকবে, একটু সাজাব না?'

'কি হচ্ছে কি?'

'কি হচ্ছে?'

'অমন বাঁকা বাঁকা কথা বলছ কেন? আমি এসেছি বলে রাগ করেছ?'

ভাবীজি চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন। আমি কিছু বলার আগেই বীথি বলল, 'কি দরকার ছিল এত কষ্ট করার?'

ভাবীজি চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'না, না, কষ্ট কি?'

আমি বীথির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সায়গল সাহেব আর ভাবীজি না থাকলে তো আমায় চাকরি ছেড়ে পালাতে হতো।'

'চুপ করো ভাইসাব।'

একটু গল্প-গুজব করার পর বীথি বাথরুমে ঢুকল। আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে বলে এলাম একটু পরে খাবার পাঠিয়ে দিতে।

ফিরে আসার পর পরই বীথি স্নান সেরে বেরুল। বাথরুমটা ছোট। ভালোভাবে কাপড়-চোপড় পরা যায় না। শায়া-ব্লাউজ পরে কোনোমতে শাড়িটা জড়িয়ে ঘরে এল। এমন বেশে ওকে কোনোদিন দেখিনি। হাঁ করে চেয়ে রইলাম। চোখে চোখ পড়তেই ও বলল, 'আঃ! কি অসভ্যতা করছ? যদি ভাবীজি দেখতে পান?'

'কিচ্ছু হবে না।'

'আমি কাপড়-চোপড় পরিনি আর তুমি হাঁ করে দেখছ, তাও বলছ কিছু হবে না।'

'সত্যি কিছু হবে না। ভাবীজি তো সারাদিনই শুধু শায়া-ব্লাউজ পরে থাকেন?'

'বাজে বকো না।' শাসন করার সুরে বলল।

'সত্যি বলছি! এখানকার সব মেয়েরাই বাড়িতে শুধু শায়া-ব্লাউজ পরে থাকে।'

'এই ভাবীজিও?'

'হ্যাঁ।' তারপর বললাম, 'সব ভাবীজি, মাতাজিরই বাড়িতে এই পোশাক।'

কথা বলতে বলতে শাড়ি পরা হয়েছিল। আঁচলটা ঠিক করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে ভালোই আছ?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে ভালোই থাকব।'

খেতে খেতে দু'বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করলাম। 'মার শরীর কেমন আছে রে?'

'শরীর মোটামুটি ভালোই তবে বড় বেশি চিন্তা করেন।'

'এখানে থেকেই তা আমি বেশ বুঝতে পারি।'

ও হয়তো আমার মুখ দেখে মনে করল আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। তাই সান্ত্বনা জানাল, 'তবে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'আর মাসিমা?'

'পি. জি.-তে দেখাবার পর ভালো আছেন।'

'টেনু পড়াশুনা করছে নাকি খুব আড্ডা দিচ্ছে?'

'পড়াশুনা করছে ঠিকই তবে আজকাল ওর অনেক বন্ধুবান্ধব।'

'আমি না থাকায় ওর আরো মজা হয়েছে।'

'তা ঠিক।'

সায়গল সাহেবের একটা খাটিয়া নিয়ে আমার এই ছোট্ট ঘরের মধ্যে বীথির জন্য বিছানা বিছিয়েছি। খাওয়া-দাওয়ার পর বললাম, 'একটু বিশ্রাম কর।'

'বিশ্রাম আবার কি করব?'

'চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে এলি, একটু বিশ্রাম করবি না?'

'না না, বিশ্রাম করতে হবে না। তার চাইতে চল ঘুরে আসি।'

'কোথায় ঘুরবি?'

'যেখানে হোক।'

'এই দুপুরে?'

'তাতে কি হয়েছে?' ওপাশ থেকে উঠে আমার পাশে বসল। 'তাছাড়া এখানে ঠিক কথাবার্তা হবে না।'

আমি হাসলাম। 'কথাবার্তা বলতে আবার কি অসুবিধা?'

বেরুলাম তবে একটু পরে। রোদ্দুরের তেজটা কমলে। মেন মার্কেটে গিয়ে একটা স্কুটার নিয়ে গেলাম বুদ্ধ জয়ন্তী পার্ক। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ওর খুব ভালো লাগল। তারপর বসলাম। ওর কাজকর্ম সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিলাম।

'কোথায় সুটিং হবে?'

'একদিন রেলস্টেশনে আর দু'দিন কোনো একটা ধর্মশালায়। তাছাড়া কিছু রাস্তাঘাটের শট নেবে।'

'কখন সুটিং হবে?'

'খুব ভোরে। সূর্য ওঠার পর পরই সুটিং হবে। তাই খুব ভোরেই লোকেশনে গিয়ে সব রেডি হতে হয়।'

'তারপর সারাদিন চলবে?'

'না, না। বড়জোর সাড়ে নটা-দশটা পর্যন্ত। তারপর দরকার হলে এই রকম সাড়ে তিনটে-চারটের সময়।'

উঠে পড়লাম। গেটের কাছে এসেই বীথি দুটো আইসক্রিম কিনল। 'এই নাও।'

'এখন আইসক্রিম খাবো?'

'তাতে কি হলো!'

আইসক্রিম খেতে খেতে বাইরে এসে দেখলাম দুটো ট্যাক্সি আছে কিন্তু কোনো স্কুটার নেই। একটু দাঁড়ালাম।

'কি হলো?' চলো।'

'দেখি স্কুটার আসে কি না।'

'অযথা দাঁড়িয়ে না থেকে চল ট্যাক্সিতেই যাই।'

'কয়েক মিনিট দেখি। না পেলে তো ট্যাক্সিতেই যাব।'

বীথি আমার হাত ধরে টানল, 'চল। আর দাঁড়াতে হবে না।'

ট্যাক্সিতে উঠেই বললাম, 'কনট প্লেস!'

বীথি আমার একটা হাত ওর হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, 'বেণুদা!'

'কি?'

'এই প্রথম তোমার সঙ্গে সত্যিকার বেড়াতে বেরিয়েছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কদিন খুব ঘুরব, বুঝলে?'

'দেখি ছুটি পাই কিনা।'

'ওসব আমি জানি না। আমি তোমাকে এক মিনিটের জন্যও ছাড়ছি না।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললাম, তাই বলে আমি সুটিং' এ যাচ্ছি না।

'লোকেশনে আমাকে পৌঁছে দেবে, নিয়ে আসবে তো?'

'তা হতে পারে।'

ও এবার হাত ছেড়ে আমার মুখটা ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি ফিল্মে নেমেছি বলে তোমার রাগ হয়?'

শুকনো হাসি হেসে বললাম, 'রাগ হবে কেন?'

'একটুও হয় না?'

'রাগ হয় না তবে...'

'তবে কি?'

'শুনেছি ফিল্ম লাইনটা তো তত ভালো না, তাই...'

ও হাসতে হাসতে বলল, 'ভয় হয়! তাই না?'

আমি হাসলাম।

ও আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ভয় নেই।'

কনট প্লেসে এক চক্কর ঘুরলাম। মাঝে মাঝেই ও আমার হাতটা চেপে ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলছিল, 'এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন?'

'তাড়াতাড়ি হাঁটছি নাকি?'

'তবে কি? একটু দেখতে দাও।'

আস্তে আস্তে আবার কিছুটা ঘুরলাম। দেখলাম।

এবার বীথি জিজ্ঞাসা করল, 'ক'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে?'

'কেন?'

'একটু দেরি করে ফিরলে অসুবিধা হবে না তো?'

'এগারটার মধ্যে ফিরলেই হয় তবে তাড়াতাড়ি না ফিরলে খাবার পাব না।'

ইউনাইটেডে কফি হাউসে কফি খেতে ঢুকেছিলাম কিন্তু বীথির জন্য ডিনার খেলাম। আমি অনেকবার বারণ করলেও ও শুনল না। বলল, 'আমার ইচ্ছা করছে তোমাকে খাওয়াতে, তুমি খাবে না?'

'আমার জন্য বাজে পয়সা খরচ না করে তোদের সংসারে ব্যয় করিস।'

'সংসারের প্রয়োজন না মিটিয়ে ব্যয় করছি না।'

বাড়ি ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বীথি বলল, 'দ্যাখো বেণুদা, টাকা-পয়সা খরচ

করার জন্য তুমি আমাকে কিছু বলবে না। জীবনে তো কোনোদিন আনন্দ করিনি, নিজের জন্য, তোমার জন্য ব্যয় করিনি। এই প্রথম। সুতরাং কিছু বললে কিন্তু দারুণ দুঃখ পাব।'

'কতগুলো বাণ্ডিল এনেছিস?'

'বাজে বকো না।'

'বল না কতগুলো বাণ্ডিল এনেছিস?'

'আমি হোটেলে থাকছি না। পাঁচ দিনের খরচের জন্য প্রডিউসারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি আর আমিও টাকা জমিয়েছিলাম...'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর?'

ও হাসল। 'আর কাল-পরশু এদেরই পেমেন্ট পাবার কথা আছে।'

'এরা তোকে কত দেবে?'

'হাজার দুয়েক।'

'এত কম টাকা দেবে?'

'আমি টাকাকড়ি নিয়ে কিছু বলিনি। যা দিচ্ছেন তাই নিচ্ছি। তবে এই বইটা সাকসেস্‌ফুল হলে পরের ছবিতে আমি ভালো চান্স পাব বলে মনে হয়।'

বাড়ি ফিরে সায়গল সাহেবের সঙ্গে বীথির পরিচয় করিয়ে দিলাম। সবাই মিলে একটু গল্পগুজব হলো। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে বেশ ক্লান্তবোধ করছিলাম। উঠে পড়লাম। শুতে গেলাম। দরজা খুলে রেখে পর্দা টেনে শুতে গেলাম।

ও যেন গাছের থেকে পড়ল, 'একি? দরজা খোলা থাকবে?'

'হ্যাঁ! রোজই থাকে।'

রোজ থাকে বলে আজ থাকবে কেন?' ও দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি দরজা বন্ধ করছি।'

'না, না। ওঁরা কি ভাববেন?'

'কি আবার ভাববেন? দরজা খুলে কেউ শোয় নাকি?'

'তাতে কিছু হবে না।'

শেষ পর্যন্ত দরজা দুটো ভেজান হলো। আলো অফ্ হলো। দুজনে দুজনের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

বীথির চিঠি পাবার পর ওকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভেবেছি অনেক কিছু। সারা অতীত। গ্লানিতে নিজের মনটা ভরে গেছে। চোরের মতো লুকিয়ে

লুকিয়ে ওদের উপভোগ করতে ঘেন্না হয়েছে। আবার লোভও হয়েছে। ও যখন স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসছে তখন অত ভাবনা-চিন্তার কি আছে?

ও ওই বিছানায় শুয়েছে, আমি এই বিছানায়। ঘরে আলো নেই। সায়গল সাহেবরাও আলো অফ্ করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন। আমি নির্বিবাদে ওপাশের বিছানায় যেতে পারি। ওর উত্তপ্ত যৌবন উপভোগ করতে পারি। ওপাশের বিছানাতেও যাবার দরকার নেই, হাত বাড়ালেই ওকে পেতে পারি। পারি অনেক কিছু। সারাদিন ওকে কাছে পেয়েছি। শুধু সান্নিধ্য নয়, আরো কিছু পাবার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু না, উৎসাহ পাইনি। এখনও পাচ্ছি না। যে দ্বন্দ্ব, গ্লানিতে দীর্ঘদিন জ্বলে পুড়ে মরেছি...

'এই বেণুদা!'

ও খুব চাপা গলায় ডাকল কিন্তু আমি জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

'বেণুদা! ঘুমিয়ে পড়লে?'

তবুও উত্তর দিলাম না। দেব না!

ও আপন মনেই বলল, আশ্চর্য! শুতে না শুতেই ঘুম!'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। এবার সত্যি আমার ঘুম আসছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে। দুচার মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু ঘুম আসার আগেই বীথি উঠে এল আমার বিছানায়। পা দুটো মুড়িয়ে আমার মাথার কাছে বসল। কনুইতে ভর দিয়ে ঝুঁকে বসল। আমার নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় লাগছে। ওর গায়ে লাগবে। হয়তো ধরা পড়ে যাব।

ও আস্তে আস্তে আমার কপালে মাথায় হাত দিতে দিতে খুব মিহি সুরে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছ? উঠবে না?'

ইচ্ছা করছে উত্তর দিই, কিন্তু পারছি না। পারলাম না।

'তোমার জন্য এতদূর থেকে ছুটে এলাম আর তুমি ঘুমোচ্ছ?'

শুনতে বেশ লাগল।

আমার মুখের ওপর মুখ রাখল, 'শুনছ? উঠবে না?'

খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লাম। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তেই মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করলাম, উঃ।

দু'হাতে আমার মুখটা জড়িয়ে ধরে বললো, 'ঘুমোচ্ছ কেন? কিছু বলবে না?'

কতক্ষণ আর অভিনয় করা যায়? 'কে?' এমনভাবে বললাম যেন ঘুমোচ্ছি।

'ঘুমোচ্ছ কেন? শুতে না শুতেই ঘুম?'

'কি?'

'কিছু কথাবার্তা না বলেই ঘুমিয়ে পড়লে?'

'কি কথা?'

'কতদিন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলি না বলো তো?' একটু মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, 'আমাকে একটু আদর না করেই ঘুমিয়ে পড়লে?'

'ভীষণ ঘুম পেয়েছে যে।'

'আজকেও ঘুমোবে?' হাত দিয়ে একটু ঠেলে বলল, 'সরো, শুতে দাও।'

বীথিকে ছেলেবেলা থেকে দেখলেও যৌবনে হঠাৎ একদিন ওকে নতুন করে আবিষ্কার করি। সে আবিষ্কারের আনন্দে, উত্তেজনায় ভেসে গেছি। ভাসতে ভাসতে ওকে দেখছি কিন্তু সে দেখার সঙ্গে তো আজকের দেখার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না! ওর মধ্যে কামনার আগুন দেখেছি কিন্তু ভালোবাসার মঞ্জু-শিখা তো বিশেষ দেখিনি। এখন এই অন্ধকারে কি সেই মঞ্জু-শিখা দেখতে পাচ্ছি? আগে তো কোনোদিন ওকে এমন করে কথা বলতে শুনিনি। আর ওর কথাগুলো যেন বসন্তদূতের কণ্ঠস্বরের চাইতেও মিষ্টি লাগছে।

'কত কথা বলব বলে তোমার কাছে এলাম? কি আশ্চর্য লোক তুমি!'

'এখন আবার কি কথা?'

'কত কথা।' ও যেন চুরি করে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল, 'তোমাকে তো কিছুই বলা হয়নি।'

'তার মানে?'

'তার মানে যদি জানতে তুমি কি আমাকে ইগনোর করতে পারতে?'

আমি আলতো করে ওর গাল টিপে বললাম, 'তোকে আমি ইগনোর করি?'

'বেণুদা, আমি সব বুঝতে পারি কিন্তু আমার তো উপায় নেই...'

'এই রাত্তিরে কি আজে-বাজে বকতে শুরু করলি?'

ওকে দেখতেও পাচ্ছি না কিন্তু যেন মনে হলো ও একটু হাসল। 'আজে-বাজে কথা বলার জন্যই আমি তোমার কাছে ছুটে গেলাম, তাই না?'

মান-অভিমানের অভিব্যঞ্জনা চলল কিছুক্ষণ।

তারপর।

বীথি পাশ ফিরে আমার দিকে কাত হলো। ডান হাতটা আমার মুখের ওপর রাখল! 'আমাদের তিন বোনের মধ্যে জ্যাঠামণি আমাকেই সব চাইতে

বেশি ভালোবাসেন, তা জানো?'

'তুই সব চাইতে ছোট বলে তোকে ভালোবাসা তো স্বাভাবিক।'

এবার ওর হাসির মৃদু আওয়াজ পেলাম। 'স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে?'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। ও বাধা দিল, 'থাক। আর তর্ক করতে হবে না।'

'আমি ছেলেবেলায় জ্যাঠামণির ডিসপেন্সারিতে বসে বসে মিষ্টি ওষুধ খেতাম জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি দিদির সঙ্গে খেলা করতে আর আমি জ্যাঠামণির কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। জ্যাঠামণি আমাকে কত কি খাওয়াতেন। কত কি দিতেন!...

আমি চুপ করে শুনছি।

'আস্তে আস্তে বড় হলাম। স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হলাম। বাড়িতে বিশেষ কারুর মত ছিল না আমি কলেজে পড়ি। জ্যাঠামণি তা জানতেন বলেই উনি নিজে গিয়ে আমাকে কলেজে ভর্তি করে আসেন। তুমি এসব কিচ্ছু জানো না।'

'তাই নাকি?'

'মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবে।' ও একটু থামল। একটা ছোট চারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। একটু বোধহয় ভাবল। 'প্রথম দিন কলেজ যাবার সময় ডিসপেন্সারিতে গিয়ে জ্যাঠামণিকে প্রণাম করতেই উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন, প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন আর বললেন...'

আমি অবাক হয়ে ওর কথা শুনছি!

'...বললেন তোর মত যদি আমার একটা মেয়ে থাকত তাহলে বেশ হতো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জ্যাঠামণি, আমি তো আপনারই মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উনি একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠলেন, একশ'বার তুই আমার মেয়ে। বেণু এম. এ পাশ করলেই তোকে আমি...

বীথি আর পারল না। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখের পাশে মুখ লুকালো। অনেকক্ষণ আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম কিন্তু একটি শব্দও মুখ দিয়ে বেরুলো না! হঠাৎ মনে হলো গলার কাছে ভেজা ভেজা লাগছে।

'একি? তুই কাঁদছিস? কাঁদছিস কেন?'

অনেকক্ষণ আদর করার পর ও শান্ত হল।

'ওই কথা শোনার পর শুধু তোমার কথাই ভাবতাম। চব্বিশ ঘণ্টা। রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারতাম না। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে উঠলাম। তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি?'

'তুমি খারাপ ভাববে না?'

'খারাপ ভাবব কেন?'

'তোমাকে ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছা করত। তাছাড়া তখনকার বয়সটা তো খুব খারাপ ছিল।'

ওর কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, 'এখনকার বয়সটা বুঝি খুব ভালো?'

'ভালোই তো!'

রাত্রি যে কখনও এত মিষ্টি, এত মধুর, এত পরিপূর্ণ হয় তা আগে জানতাম না। জানতাম না আমার অজ্ঞাতে আমার জীবন-কাহিনি এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব কথা তুমি আগে বল নি কেন?'

'কোনোদিন তো তোমার উৎসাহ দেখিনি...'

'আজকে বললে কেন?'

'মাসিমা বলতে বলেছেন।'

'হ্যাঁ। তুমি চিঠি লিখলেই সব জানতে পারবে।'

'মা সবকিছু জানেন?'

'সবকিছু।'

'কিন্তু মা তো আমাকে কোনোদিন কিছু বলেননি?'

'ঠিক সুযোগ পাননি।' একটু থামল। 'তবে আমাদের বাড়ির সবাই জানে।'

চমকে উঠলাম। 'সবাই?'

হ্যাঁ।'

'তোমার দিদিরাও?'

'হ্যাঁ।' আবার একটু থামল। 'জ্যাঠামণির ইচ্ছা ছিল বলেই তো মেজদি তোমাকে এতবার করে এম. এ. পড়ার জন্য চিঠি দেয়।'

এবার যেন অনেকটা পরিষ্কার হলো। তবুও মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা, অনেক কিন্তু থেকে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম কিছুই জিজ্ঞাসা করব না। আবার ভাবলাম, না, না, সবকিছু জেনে নেওয়াই ঠিক হবে।

'কিন্তু তুমি ফিল্মে নামলে কেন? ওই জানোয়ার শিশিরদার সঙ্গে তোমার এত ভাব কেন?' রাগের মাথায় হঠাৎ বলে ফেললাম।

ও অত্যন্ত শান্ত, ধীর-স্থির ভাবে বলল, 'আর কি জানতে চাও?'

আমি গম্ভীর হয়ে রইলাম।

ও একটু পরে বলল, 'বাবার দেনা শোধ করার জন্য, সংসারের তাগিদে আমি ফিল্মে নেমেছি। মা, মাসিমার অনুমতি নিয়েই নেমেছি। চুরি করে বদমায়েসি করার জন্য সিনেমায় নামিনি...'

'তাতো আমি বলিনি কিন্তু...'

'আমাকে শেষ করতে দাও। সিনেমায় নেমে বদমাইসি করলে তোমার কাছে কাঙালের মতো একটু আদর পেতে, একটু ভালোবাসার জন্যে যেতাম না...'

'আঃ! আমি কি...'

'আর একটু ধৈর্য ধর। ফিল্মে নামার জন্য শিশিরদার কাছে যাই না, যাই দেনা শোধ করতে। তাছাড়া যে লোকটা মেজদির জীবন প্রায় নষ্ট করে ফেলেছিল তাকে...

'তার মানে? কি হয়েছিল গীতির?'

'তুমি পুরুষ হয়ে সে কথা না হয় নাই জানলে। জানোয়ারটাকে চাবুক মেরে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ালেও আমার রাগ যাবে না আর তুমি বলছ...'

ও আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। আমিও না।

বীথির কাছে হেরে গিয়েও একটা পরম পরিতৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল।

দশ

অসহ্য, অব্যক্ত একটা বেদনায় সারা মনটা ভরে আছে। কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি। প্রায় তিন বছর বাড়ির বাইরে। মা আর পারছেন না। তারপর টেনু। সত্যি ও বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। মণ্টুর সঙ্গে বোধহয় মেলামেশা করা পছন্দ করে না। তাছাড়া মণ্টু ঠিক ওর মতো বুদ্ধিমান নয়। কেমন একটু ডাল্। হয়তো আরো কিছু কারণ আছে। আমি ওর চাইতে অনেক বড় আমাকে সব কথা বলতে চায় না। পারে না।

এই ক'বছরে মা'র শরীরটা দারুণ ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে চোখ দুটোর জন্য বড় কষ্ট হয়। তবুও সংসার ঠেলতে হয়। টেনু বাড়িতে না থাকলে কখনও মা ফণিদার দোকানে গিয়ে টাকা পয়সা আর রেশনকার্ড দিয়ে আসেন অথবা বাদলদার দোকানে টুকটাক এটা ওটা আনার জন্য যান। হরি ঘোষের চায়ের দোকানের ছেলেগুলো দেখলে ওরা মাকে দোকানে যেতে দেয় না। নিজেরাই এনে দেয়।

এসবই জানতে পারি কিন্তু কিছু করতে পারি না। শুধু মনে মনে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আমার করার কিছু নেই। তাছাড়া টাকাকড়ির টানাটানি তো আছেই। বাবা ওই ডিসপেন্সারিতে বসে বসেই রোজ বিশ-পঁচিশ টাকা আয় করতেন। আর এখন? আমার দুশো আর ডিসপেন্সারির ভাড়া পঁয়ষট্টি। মা তো কোনোদিন এত টানাটানির মধ্যে জীবন কাটাননি! বাবা সামান্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হলেও মাকে খুব সুখে রাখতেন। মার বাড়িতে পরার জন্য বাবা পঁচিশ-তিরিশ টাকা দামের ভালো ভালো তাঁতের শাড়ি কিনতেন। মা আপত্তি করতেন। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, তোমাকে এর চাইতে কম দামের কাপড় পরলে ভীষণ খারাপ লাগে। আর আজ? ভাবতে পারি না।

টেনু বড় হচ্ছে। তবু ও কিছু বোঝে না। মা রোজ ওর স্কুলের জামা-প্যান্টে নিজে সাবান দেন। ও বোঝে না মার কত কষ্ট হয়।

কত জায়গায় অ্যাপলিকেশন করছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সাত-আট জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম, তাও কিছু হল না। অথচ একটা সুবিধে মতন

চাকরি না নিয়ে কলকাতা যাই কি করে? কিন্তু এখানে আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না। অফিসে কতজনের সঙ্গে ভাব। কতজনের সঙ্গে ক্যান্টিনে বসে বসে আড্ডা দিই অথচ কারুর সঙ্গে ঠিক বন্ধুত্ব হল না। কেউ আমাকে তুই বলে না, তুমি বলে না। আমিও বলি না। বলার সুযোগ পাইনি। পাই না। এখানকার প্রাচুর্যের চাইতে আমাদের নোংরা টালিগঞ্জ অনেক ভালো। ওরা টেরিলিন-টেরিকট পরে না কিন্তু দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে ছুটে এসে পাশে দাঁড়ায়। ওরা বিড়ি খায়, খিস্তি করে কিন্তু মাকে মাসিমা বলে, সামনা-সামনি দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। ওরা পলিটিক্স নিয়ে, খেলাধুলো নিয়ে, সবকিছু নিয়ে তর্ক করে, ঝগড়া করে। কখনও কখনও হাতাহাতি করে কিন্তু তবুও নিউএম্পায়ারে অজিতেশ বা সবিতাব্রতের থিয়েটার দেখার সময় দলবেঁধে না গিয়ে পারে না।

তাছাড়া গীতি যখন বিয়ে করছে তখন আর শুধু শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব কেন? ও তো খোলাখুলিই সব লিখেছে, তোদের মতো লেখাপড়া শিখিনি বলে আমি অনেক স্থূল। ~~তুই~~ আমার একমাত্র বন্ধু। তুই সব কিছু জানিস। শুধু একটা কথা তোকে জানাতে পারিনি। কোনো উপায় ছিল না। যাইহোক বিয়ে করছি। আমাদের হাসপাতালের একজন কম্পাউন্ডারকে। ছেলেটা খুব সাধারণ, তবে বেশ ভালো। আমার পক্ষে এইরকম সাধারণ স্বামী হওয়াই ভালো।

দু-এক মাসের মধ্যেই ওদের বিয়ে হবে। বীথির চিঠিতে জানলাম মাসিমা খুব দুঃখ করে চিঠিপত্র লেখার পরই ও বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। জানি না ও আমার ওপর অভিমান করেছে কিনা। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ভীষণ বাস্তববাদী মেয়ে। হয়তো আমাকে মুক্তি দেবার জন্যই, হয়তো বীথির কথা চিন্তা করে, বাবা-মার কথা ভেবে রাজি হয়েছে। মনটা কেন খচ্ খচ্ করছে ঠিকই কিন্তু আমি কি করব?

হবে না।

বিশ্বাসের পাল্লায় পড়ে আইফ্যাক্সে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর হোটেলে খেয়ে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হল। দরজা খুলে আলো জ্বালাতে না জ্বালাতেই ভাবীজি এসে একটা লম্বা খাম দিয়ে গেলেন। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের চিঠি? এতদিন পরে?

কি? তিনশ-ছ'শো'র গ্রেডে সেলস্ এসিস্ট্যান্টের চাকরি? ক্যালকাটা রিজিওন্যাল অফিসে?

ডাউন কালকা-দিল্লি-হাওড়া মেলের শ্লিপার কম্পার্টমেন্টে বসে মনে পড়ছে আসার দিনের কথা। লাউড স্পীকারের মেয়েটি বার বার অ্যানাউন্স করছে, ওয়ান আপ কালকা মেল সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে ন'নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে ওয়ান আপ কালকা মেল উইল লিভ ফ্রম প্ল্যাটফর্ম নাম্বার নাইন অ্যাট নাইনটিন ফর্টি আওয়ার্স। ওয়ান আপ কালকা মেল...

সেদিন কেমন যেন ভয় করছিল। সবাই স্টেশনে এসেছিল কিন্তু কারুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারিনি। মনে হয়েছিল অন্ধকার অনিশ্চিতে ঝাঁপ দিচ্ছি। আর আজ? কেউ স্টেশনে আসেনি তবুও ভয় করছে না। একটুও ভয় করছে না। বরং ভালো লাগছে। দারুণ ভালো লাগছে। আমি যে কলকাতা চলেছি। পুবের দেশে চলেছি। পুবের দেশেই তো সূর্য ওঠে।